তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা - ১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৬
চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
উৎপল প্রেস
১১০-১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

২৯১২
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
১৮.১১.৫৭

তিন টাকা

সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়
করকমলেষু

লাভপুর
বীরভূম

সূচীপত্র

হারানো সুর

দস্তুর নাকি কদাচিৎ মুর্খ হয়,—শাস্ত্রবাণী।

ননীপাল এই 'কদাচিৎ' পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু বুদ্ধি তাহার যেরূপ প্রখর ও সূক্ষ্ম তাহাতে সুযোগ পাইলে সে যে শাস্ত্রবাণী সফল করিতে পারিত তাহা ঠিক। কিন্তু সূক্ষ্ম সূচ পাহাড়ের গহ্বরে খাপও খায় না, খেইও পায় না! ননীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি বিরাট সংসারগহ্বরে ঠিক তেমনি ভাবেই খাপও খাইত না, খেইও পাইত না। সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিন্নবাসে সূক্ষ্ম সুঁচের মতই খাপিয়া যাইত। শিল্প কার্য্যে তাহার নৈপুণ্য ছিল চমৎকার। কিন্তু এই নৈপুণ্য কোন গ্রহবৈগুণ্যহেতু কি না জানি না—শুধু অকাজেই প্রকাশ পাইত। সংসারে একদল লোক আছে সুস্থ সবল দেহ, জোর করিয়া বেগার খাটাও খাটিবে কিন্তু স্বেচ্ছায় খাটিয়া উপার্জ্জন করা তাহাদের ধাতে সয় না।

ননীর বুদ্ধিটাও ওই দলের। বারোয়ারীর প্রতিমার জন্য ডাকসাজ সে তৈয়ার করিতে পারে, কিন্তু ডাকসাজের ব্যবসায়ের কথায় কর্ণপাত করে না, ঐ রূপেই বাউলের একতারা দেখিয়া একতারা, সাঁওতালদের বাঁশী দেখিয়া বাঁশী তৈয়ার করিতেই তাহার এই নৈপুণ্য অপদেবতার উপসর্গটি যোগে ব্যয়িত হইত।

লোকে বলিত শুধু ওই উপসর্গটিই নয়, দেবতাটি সমেত তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে, কারণ দেশশুদ্ধ লোকের জমিতে যখন ধান্যশীর্ষ স্বর্ণে-সুধায় অবনমিত তখন ননীর জমিতে ফুলফলহীন কোন উৎকট বৃক্ষের রুক্ষ শীর্ষ ননীর অধিকারিত্বের পরিচয় দিত।

লোকে বলে—এ কি ভাল হচ্ছে ননী?

ননী তখন অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া বক্তার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বুক বাজাইয়া গাহিয়া উঠে—

"এ——তোমার ভাল তোমাতে থাক
আমায় তো তার ভাগ দেবে না—
এ—তোমার ভাল————"

মোট কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, মধুর চেয়ে মাধুর্য্যের দিকেই

তাহার আসক্তিটা ছিল অতিরিক্ত, তাই লোকে যখন শস্যের চাষ করে তখন সে ফুলের বাগান করে, আর লোকে যখন হিসাব নিকাশ করে তখন সে বাঁশী বাজায়।

লোকে বলে—বাঁশীই বাজাইবে ননী।

ননী প্রবলতর উৎসাহে বাঁশীতে সুর তোলে।

* * * *

দিনের পর দিন আসে সেই একই ভাবে; সেই প্রভাত, সেই সন্ধ্যা আলোছায়ায় মাখামাখি,—সবই সনাতন, সবই চিরন্তন; কিন্তু মানুষের দিনের পর দিনের সঙ্গে তাহার শৈশব যায়, কৈশোর আসে, কৈশোরের বৃন্তে যৌবনের মঞ্জরী ফুটিয়া উঠে, নিটোল যৌবনের পথ ধরিয়া কুঞ্চনের রেখায় রেখায় বার্দ্ধক্য দেখা দেয়, সুখের হাসি ফুরায়, দুঃখের কান্নার দিন মলিন হয়, মানুষের দিন একভাবে যায় না।

ননীরও গেল না।

বাল্যে বিবাহিত ননীর বালিকা স্ত্রী যুবতী হইয়া আসিয়া একদিন ঘর জুড়িয়া বসিল। সেইদিনই ননীর হাত হইতে একতারা খসিল, অধরপ্রান্ত হইতে বাঁশী নামিল।

না নামিলে উপায় কি? একতারার ঝঙ্কার পথের উপরেই বাজে ভাল, বাঁশীর সুর বনে উপবনেই ভাল জমে, কিন্তু বদ্ধ দ্বার গৃহকোণে গানও কাঁদে, গায়কেরও জমে না।

মুক্তির আনন্দ বন্ধনের মধ্যে বিকাশ পায় না।

নামাইতে ইচ্ছা ননীর ছিল না, কিন্তু পত্নী গিরি কোমলাঙ্গী তন্বী হইলে কি হয়, রাশির ওজনে গিরির মতই গুরুভার। তাই গিরি ঘাড়ে চাপিতেই ভারের টলমলানিতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেই বেচারা ননী বাঁশী একতারা মাটিতে ফেলিয়া দুই হাতে গিরিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘাড় বাঁচাইতে বাধ্য হইল।

ঘটনাটা ঘটিল প্রথম দিনেই, যেদিন গিরি আসিয়া জাঁকিয়া ননীর বাড়ীতে বসিল সেই দিনই।

সকালে ননী গিরিকে বাড়ীতে আনিয়াই অভ্যাস মত পাড়া বেড়াইয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিল।

গিরি রান্না করিতেছিল।

ননীর ইচ্ছা ছিল—বেশ একখানা ভাল পদ গিরিকে শুনাইয়া দেয়!

কিন্তু রন্ধনরতা গিরি ঝঙ্কার দিয়া বলিল—মা গো মা! কি মানুষ গো তুমি! গেরস্ত ঘরের এই কি ছিরি? ঘরে একখানা কাঠকুটো নাই, কিসে রান্নাবান্না হয় বল তো? ভাগ্যে তবু এইগুলা ছিল, দেশের বাঁশী! এত বাঁশী কি হয় সাঁওতালদের ঘরের মত?

ফুল ফেলিয়া কেহ মূলের দিকে তাকায় না, গিরির মুখ ফেলিয়া রন্ধন বা ইন্ধনের দিকেও ননী চাহে নাই; গিরির কথায় কাঠের দিকে চাহিতেই ননী চমকিয়া উঠিল,—সর্ব্বনাশ! বাঁশীর বোঝা উনানের মুখে, কয়টা জলিতেছে!

মাথাটা তাহার দপ্ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই গিরির যৌবনোজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া তাহার অন্তরটা নরম হইয়া গেল; প্রথম দিনেই ঝগড়াটা ভাল নয় বলিয়া নয়, গিরি জানে না বলিয়া নয়, কি জানি কেন, বোধ হয় দাম্পত্যকলহ যে কারণে স্থায়ী হয় না সেই কারণটা বর্ত্তমানে প্রবলতম ভাবে ননীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাই।

ননী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বাঁশীর বোঝা তুলিতে তুলিতে মনকে বুঝাইল,—বাঁশই পুড়িল বাঁশী তো পুড়িল না, গিরির ক্রোধবহ্নিতে মদনের মত বাঁশী ভস্ম হইলেও অতনুর মত সুর তো রহিল, প্রদ্যুম্নের মত জন্মান্তর লইতে কতক্ষণ!

গিরি দেহখানা বাঁকাইয়া ননীর দিকে চাহিয়া কহিল—তুলছ যে!

ননী ব্যস্তভাবে কহিল—কাঠ আনছি।

গিরি কহিল—আনতে আনতে উনোন নিবে যাবে!

ননী কহিল—তা ব'লে বাঁশীগুলো—

গিরি কহিল—তা ব'লে বাঁশীগুলো রাখ বলছি, ওতেই আমি রাঁধব। আমি সব শুনেছি। বাঁশী কাঁসি বাজিয়ে আর চলবে না। রাখ...

গিরি বাঁশীর বোঝা ধরিয়া টান মারিয়া কথাটার উপসংহার করিল। তৈলমসৃণ বাঁশীর বোঝা, টানে ননীর হাত হইতে পিছলাইয়া দাওয়ার উপর ছড়াইয়া পড়িল।

দুর্দ্দান্ত ননীর আচ্ছন্ন অন্তর ঐ এক টানেই যেন সজাগ হইয়া উঠিল, সে হাঁকিয়া উঠিল—খবরদার, ভাল হবে না বলছি।

হাঁকে ডাকে গিরি নড়িবার নয়, সেও একগাছা বাঁশী কুড়াইয়া লইয়া উনানের হাঁড়িটায় সজোরে একটা আঘাত করিয়া কহিল—তবে থাক্ রান্না চুলোর ভেতর।

হাঁড়িটা ভাঙিয়া হাঁড়ির ভাত আগুন নিবাইয়া রাশিকৃত বাষ্পধূম উদ্গীরণ করিল।

স্তম্ভিত ননী বিস্ফারিত নেত্রে ধূমরাশির দিকে চাহিয়া রহিল। সাধের বাসা তাহার প্রথম দিনেই সখের বাঁশীর আঘাতে ভাঙিয়া অমিলনের আগুনে পুড়িয়া ধূমশিখায় উড়িয়া গেল।

গিরি গিয়া ঘরের দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। ননী ক্ষণেক সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নির্বাপিতপ্রায় উনানের মুখে বসিয়া ফুঁ পাড়িয়া আগুনটাকে সজাগ করিল; পুনরায় নিজেই রান্না চড়াইল আর একটির পর একটি করিয়া বাঁশী আগুনের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

ভাত গলিয়া ডাল হইল তবুও ইন্ধন যোগানের বিরাম নাই; বাঁশী ফুরাইল, ননী ভাত নামাইল।

সহসা ননীর বুকে খিল ধরাইয়া চপল হাস্যধ্বনি উঠিল—খিল্ খিল্ করিয়া কে হাসিতেছিল।

ননী মুখ ফিরাইয়া দেখিল ও-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া গিরি হাসিতেছে, চোখোচোখি হইতেই গিরি কহিল—রাগই তো পুরুষের লক্ষণ ; কিন্তু দেখো, এইবার তোমার লক্ষী হবে।

ননীর বক্ষ চিরিয়া একটা হাহাকারের নিঃশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। হায় মা কমলা! কোমলতায় কি তোমায় ধরা যায় না, কঠোর হওয়া চাই-ই!

সেই দিন ননী বাঁশী ছাড়িল,—সঙ্গীত ছাড়িয়া সম্পদের সাধনায় ডুবিল ; সে ডোবা যেমন তেমন নয়,—সাধ করিয়া গলায় ভার বাঁধিয়া ডোবার মত।

সম্পদের সাধনায় সারাটা দিন মাঠে অবিশ্রান্ত খাটে, সন্ধ্যায় আসিয়া মড়ার মত বিছানায় এলাইয়া পড়ে,—কথাবার্তা যাহা হয় তাও সংসার লইয়া ; কি আছে, কি নাই ইত্যাদি।

বনের চেয়ে মন আরও নিবিড় আরও জটিল—তার অন্ত পাওয়া ভার ; সেই অনন্ত নিবিড়তার মধ্যে কখন কোন্ বৃত্তি ঘুমায়—কে কখন্ জাগিয়া উঠে, কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে, সে ধারা বিচিত্র। সেই বিচিত্র ধারায় আবার কিন্তু ননীর জীবনে অশান্তি ঘনাইয়া উঠিল।

কে জানে গিরির সহসা কি হইল, মনে কি সুর বাজিল, কর্মপ্রিয়া, লক্ষীলোলুপা গিরির কিছুই যেন ভাল লাগিল না—সব চেয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিল, ওই সদাকর্মরত ননীর উপর।

ভাল লাগে না, তবুও সে ভাল লাগাইতে চেষ্টা করে।

সে বলে—কি মানুষ তুমি, হাসি নাই কথা নাই—

ননী সবিস্ময়ে বলে—হাসি তো!

সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসেও, কিন্তু সে যেন ভ্যাংচানী, গিরির গা জ্বলিয়া যায়।

কিন্তু এ দাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, দিন দিন সংসারের স্বাচ্ছল্যের শান্তির প্রলেপে এ দাহ জুড়াইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে এই স্বাচ্ছল্য, সঞ্চয়—এও ভাল লাগে না, ইহার মধ্যেও কি অভাবের সুর বাজে—কি যেন নাই, কি যেন চাই!

খোশ মেজাজে গিরি সেদিন রাত্রে কহিল—গঙ্গাজল বলছিল, তুমি বেশ গান গাইতে পার, একটা গান বল না গো!

অভ্যাস স্বভাবের স্রষ্টা; সে শিল্পীর মত হাতুড়ি নির্ম্মম ভাবে পিটিয়া পিটিয়া অসি ভাঙ্গিয়া বাঁশী গড়ে, বাঁশী পিটিয়া অসি গড়িয়া তোলে, অভ্যাসের বসে আনন্দের রাজ্যের ননী আজ কর্ম্মী, গানের কথায় সে গা দিল না, তাচ্ছিল্যভরে কহিল—হ্যাঁ। গানে কি হবে?

গিরি আব্দারের সুরে বলিল—না না একটা বল না গো।

ননী সেই অবহেলার সুরেই উত্তর দিল—হ্যাঃ, রোজ গান বলি, খেয়ে দেয়ে তো কাজ নাই আমার? আমার কাজ কত!

গিরি ঝঙ্কার দিয়া কহিল—বলি আগে তো গানের চব্বিশ পহর হত, সে বাঁশীর বোঝাও তো আমি দেখেছি। আজ না হয় কাজ করচ; তা, যে রাঁধে সে বুঝি আর চুল বাঁধে না?

তা বাঁধে, কিন্তু চুল থাকিলে বাঁধে; চুল কাটিয়া দিয়া ও কথা বলিলে চোখে জল আসে। ও কথায় বুকে আঘাত না পায় এমন লোক পৃথিবীতে নাই; বিশেষ যে জোর করিয়া চুল কাটিয়া দিয়াছে, সে-ই যদি ওই কথা বলে—তাহার কথায়।

গিরির মুখে বাঁশীর কথায় গানের কথায়, সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িল, আবেগের বান বুক তোলপাড় করিয়া তুলিল, চোয়ালের উপর সজোরে চোয়াল চাপিয়া ননী সে আবেগের কম্পনে চাপিয়া ধরিল, স্থির দৃষ্টিতে নয়নের উদ্গত অশ্রুর দ্বার রোধ করিল।

গিরি আবার সেই আব্দারের সুরে বলিল—বল না গো, একটা গান!

ননী ধরা গলায় বলিল—গান আর হয় না।

গিরি কহিল—হ্যাঁ হয় না আবার, আমায় বলবে না বল।

অভ্যাসবশে কর্মকঠোর ননী স্মৃতির উত্তাপে কেমন কোমল হইয়া

পড়িয়াছিল, সে গিরির এ অভিমানভরা নিবেদন উপেক্ষা করিতে পারিল না, সে গান ধরিল—

শ্যাম আবার কেন বাঁশী খোঁজ
বাঁশী যে ডুবেছে জলে।

ঐ এক কলি গাহিতেই কেমন গলা ভাঙ্গিয়া আসিল, সে চুপ করিয়া গেল। অন্ধকারে চোখ দিয়া জল আসিল।

গিরিও পাশ ফিরিয়া শুইল, গান ভাল লাগল না,—শুধু গান ভাল লাগিল না নয়—ঘর, সংসার, সবার উপরেই মন বিরূপ হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে এই মাঝে মাঝে কিছুই ভাল না-লাগা সুর প্রবলতর হইয়া যেন সারাক্ষণই গিরির মনে বাজিতে লাগিল।

ধনে ধানে পরিপূর্ণ সংসার, অনুগত স্বামী, গিরি যাহা কামনা করিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে, তবু যেন কি নাই, কি চাই, যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষার সকল সামগ্রী তিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ভাল লাগে না! সব চেয়ে ভাল লাগে না স্বামীর ওই পরম আনুগত্য।

ছয়টি রাগ আনন্দময়, তাহার সঙ্গিনী ছত্রিশটি রাগিনীও পুলকের ঝঙ্কারময়ী, কিন্তু সংসারের সপ্তম রাগটি রিপু, বেসুরা অশান্তি তাহার সঙ্গিনী। এই সপ্তম রাগটি সর্ব্বদাই অসন্তুষ্টা গিরিকে আশ্রয় করিয়া ননীর সংসারে বিষম বেসুরা রাগিনীর সৃষ্টি করিল, কারণে অকারণে গিরি অগ্ন্যুদ্গার করে, ছুতা-নাতায় অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দেয়। ননী ব্যস্ত হইয়া গিরির মন যোগাইতে চাষের কাজে আরো বেশী করিয়া মন দিল, দেনাদারদের কাছে ধানের বাকী আদায় করিতে অতিরিক্ত কঠোর হইয়া উঠিল।

তবুও গিরি সেই আগ্নেয়গিরি,—ননী প্রাণপণ শক্তিতে স্বাচ্ছন্দ্যের ধারা বর্ষণেও সে উত্তাপ শীতল করিতে পারিল না। গিরির বিশাল মনের গহ্বরে ননীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি আবার খেই হারাইল।

মাঘের শেষাশেষি মাঘী-পূর্ণিমায় গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে উৎসব হরিনাম সংকীর্তন, যাত্রাগান, মহোৎসব হইবে ; চলিত প্রথায় সে দিন সকলের কাজ কর্ম্ম বন্ধ, আবাল বৃদ্ধ হরিনামে মত্ত হইয়া উঠে। বণিতারা মাতে না,—দেখে।

ননীর কিন্তু সেদিনও বিশ্রাম নাই, সে মাঠে যায় নাই বটে কিন্তু সকালে উঠিয়া অবসর দেখিয়া খড়ের তাড়া বাঁধিতে লাগিয়া গেল।

গিরির সদা-ভারাক্রান্ত মন সেদিন আনন্দের আশায় একটু হাল্‌কা হইয়াই ছিল, প্রভাতে উঠিয়া ননীকে ঘরে না দেখিয়া ভাবিয়াছিল—আর পাঁচ জনের মত সেও উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছে, নিজেও উৎসব দেখিতে যাইবার ব্যাকুল আগ্রহে তাড়াতাড়ি কাজ সারিতেছিল।

উষার আভাষে কলকণ্ঠ পাখীর মতই আজ আনন্দের আশায় গিরি হর্ষোৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছে।

উৎসবের কলরোল ভাসিয়া আসিতেছে, গিরি হর্ষচঞ্চল লঘুপদে গৃহকর্ম্ম সারিয়া ফিরিতেছে।

এমন সময় খড়কুটা মাখিয়া ননী আসিয়া কহিল—দড়ি দাও তো, দড়ি এক আঁটি।

গিরির সকল আনন্দের ঝঙ্কার ডুবাইয়া ননীর ঐ কর্মনীরস ধ্বনিটি বেসুরায় বাজিয়া উঠিল ; ননীর প্রার্থিত দড়ি যেন গিরির সকল আনন্দের কণ্ঠে জড়াইয়া সব ঝঙ্কার নীরব করিয়া দিল।

তাহার মুখের দিকে, দেহের দিকে তাকাইয়া গিরি কহিল—নাম গান করতে যাও নি তুমি ?

ননী কহিল—নাঃ, খড়গুলো সামলে রাখছি, দড়ি দাও তো, দড়ি।

সেই বেসুর। গিরির প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল ; সে মিনতিকণ্ঠে কহিল—না, না, আজ ও সব থাক্, যাও নাম-গান করে এসো।

ননী কহিল, সেই আগ্রহহীন নীরস সুরে—ওরাই ডাকছে ডাকুক, আজ আমার অবসর আছে, খড়গুলো সামলে রাখি ; দাও, দড়ি দাও।

না,—তবুও না! গিরির সব যেন বিষাইয়া উঠিল, সে বোঝা খানেক দড়ি আনিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—ঐ দড়ি গলায় দাও গিয়ে। বলি—এক দিনও তো পরকালের কাজ করে লোকে! সংসার, সংসার, সংসার —বার মাস তিরিশ দিন যে করছ, এ সব কি সঙ্গে যাবে?

বাক্যবাণ সহিয়া সহিয়া ঘাটা পড়া ননীর মনে এ আঘাত ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল, ননী ক্ষণেক দিশাহারার মত বিহ্বল দৃষ্টিতে গিরির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আঁটি খানেক দড়ি লইয়া নীরবে চলিয়া গেল।

নিরুপায়ে মানুষ এলাইয়া পড়ে আবার উন্মাদের মতও হইয়া উঠে। মিনতি, অভিমান ব্যর্থ হইয়া গেল ; আবার সেই সর্ব্বনাশা প্রাণহীন সংসারের মধ্যে ঘুরিয়া পড়িবার কল্পনায় গিরি পাগলের মত হইয়া উঠিল। সে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায় ঘর-দুয়ার সব ফেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—ওই উৎসবের কলরোলের দিকে।

*　　*　　*　　*　　*

উৎসব-মণ্ডপ হইতে দূরে একটা বৃক্ষতলে আত্মগোপন করিয়া গিরি গিয়া বসিল।

তখন সংকীর্ত্তনে গাহিতেছিল—

হরি-নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে!

গিরির সকল অন্তর ওই সুরেই ধ্বনিয়া উঠিল, সকল প্রাণমন জুড়াইয়া গেল ; আঃ কি আনন্দ!

সেও গুন্‌গুন্ করিয়া ওই সুরে সুর মিশাইয়া গাহিল—

হরি-নামের গুণে···মৃত তরু মুঞ্জরে!

*　　*　　*　　*　　*

আঁধারের পর আলোর বুকে পাখী ভাসিয়া পড়ে সব ভুলিয়া, ফিরিবার চিন্তা না করিয়াই…

আজিকার আনন্দের মধ্যে গিরি তেমনি ভাবেই মাতিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর যাত্রাগান আরম্ভ হইল, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অভিনয়। সে কি সুন্দর, কি মধুর! সখীগণের হাস্য-পরিহাস, ফুলতোলা, মালা-গাঁথা, দুটি কিশোর-কিশোরীর প্রেমের কথা—অন্তহীন, যেন ফুরাইবার নয়। কথা কিন্তু দুটি—'তুমি আমার, আমি তোমার' সেই লইয়া মান অভিমান, সে মানের জন্য অনন্ত সাধ্য সাধনা!

সুরের পর সুর ফুটিয়া উঠে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে—ধাপে ধাপে পঞ্চমে সপ্তমে—

গিরির শুষ্ক নীরস সকল চিত্ত ক্রমশ আজ যেন রূপ, রস, শব্দের স্পর্শে সরস হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ওই তরুণ কিশোর প্রেমিকাটিকে তাহার বড় ভাল লাগিল, সমস্ত দেহমন যেন ওই তরুণ রূপটির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

কিশোরী প্রেমিকা তখন গাহিতেছিল—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর—
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

গিরির উন্মুখ অন্তর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ওই সুরের প্রতিধ্বনি তুলিল; তাহার বিহ্বল আবিষ্ট তন্ময় মুখ হইতে কখন বসনাঞ্চল শ্লথ হইয়া অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার হুঁস ছিল না, দীপ্ত চোখে মুখে অন্তরের ঝঙ্কার যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তাহার এই দীপ্ত তন্ময় ছবি কাহারও চোখে পড়িয়াছিল কি না, কে জানে, তবে ওই তরুণ কিশোরটি যেন তাহারই পানে ফিরিয়া অভিনয় করিতেছিল। সে যখন সুললিত কণ্ঠে গান গাহিয়া কিশোরীর নিকট প্রেম নিবেদন করিতে-ছিল তখন গিরির মনে হইল ওই নৈবেদ্য তাহার চরণে আসিয়া পৌঁছিল,—

ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।

গিরির অন্তরের অরূপ কামনা অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রে বাড়ী ফিরিল পুষ্পিত উদ্যানের মত মাতাল মন লইয়া। বন্ধ দুয়ারে সে আসিয়া ডাকিল—ওগো, ওগো!

তাহার অন্তর যেন তাহার স্বরে ভাষায় সেই অভিনয়ের সকল আবেগ সকল সুর ঢালিয়া দিতে চাহিতেছিল।

ননী দরজা খুলিয়া দিল। গিরি ত্বরিত পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া ফেলিতে লাগিল, তাহার মনে আজ আর বিলম্ব সহিতেছিল না, কত কথা, কত ভাব আজ সে প্রকাশ করিতে চায়, সে আপনাকে আজ দিতে চায়, আপনাকে পাইতে চায়।

সে শুইয়া বলিল—কি সুন্দর যাত্রা গো!

ননী কথা কহিল না, ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল।

গিরি পুনরায় কহিল—কি সুন্দর কেষ্ট গো, যেমন চেহারা, তেমনি গান।

ননী পাশ ফিরিয়া শুইল।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত্তের প্রত্যাখানেও প্রার্থনা ছাড়া গতি নাই, সহিয়া সহিয়া প্রত্যাখানেও অন্তরের গতিও তাহার প্রার্থনার দিকে। গিরির পিয়াসী অন্তর আজ এ প্রত্যাখানে বাঁকিয়া দাঁড়াইল না, সে ভিখারীর মত মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল—ওগো।

ননী তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া আসিতেছিল, তবুও এ মিনতিতে সাড়া না দিয়া পারিল না। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবেই উত্তর দিল—উঁ!

আহ্বানে সাড়া পাইয়া পুলকিতা গিরি আবেগে, সোহাগে উচ্ছল হইয়া এক নিমেষে অন্তরের সমস্ত নৈবেদ্য উজাড় করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু ভাষায় যে যোগায় না,—শেষে অভিনয়ের স্মৃতি তাহাকে ভাষা যোগাইয়া দিল, সে ডাকিল—প্রাণেশ্বর!

ননীর সকল তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে ঘাড় ফিরাইয়া সবিস্ময়ে গিরির দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

গিরি আবার কহিল, সেই স্বর,—সোহাগে মধুর, আবেগে করুণ—এই পাশে ঘুরে শোও, আজ দু'জনে ঘুমোব না, এস গল্প করি।

থেই-হারা নিদ্রাকাতর ননী কহিল—তুমি খেপেছ নাকি? বলিয়া বিরক্তিভরে ঘুরিয়া শুইল।

রূপে গন্ধে বিকশিত ফুলটি ছিঁড়িয়া দলিয়া দিলে যেমন শ্রীহীন মলিন রূপে গন্ধে ভরিয়া উঠে—তেমনি গিরির অন্তর হতশ্রী হইয়া মলিন গন্ধে কদর্য্য হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতে ননী ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, গিরি তখনও উঠে নাই, অবসাদ-ক্লান্ত দেহে আহত মনে রাত্রিটা জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

ওস্তাদ! ওস্তাদ! ননীদা হে! বলিয়া একটি তরুণ আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তুলিয়া রাখা দামী শালের মত চেহারা,—দেখিতে নবীন থাকিলেও বয়স আছে। তাহার উপর অতি অল্প গোঁফ দাড়ি কামাইয়া ফেলায় চকচকে ঘসা-পয়সার মত সৃষ্টির সন তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। তুলিয়া-রাখা শালের রিপু-কর্ম্মের চিহ্নের মত চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, গালে টোল পড়িয়াছে, হাতের শিরাগুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; মাথায় লম্বা বাবড়ী চুল, গায়ে একটা পাঞ্জাবী, হাতে একটা বাঁশী।

ননী তাহাকে দেখিয়া সানন্দে সাগ্রহে কহিল—আয়, আয় কড়ি আয়, কেমন আছিস্?

কড়ি ওরফে এককড়ি ননীর মামার বাড়ীর দেশের লোক, সম্পর্কে ভাই, যৌবনের প্রারম্ভে সুরের রাজ্যে তরুণ ননীর সে পরম অন্তরঙ্গ ছিল, গানে বাঁশীতে ননীর শিষ্য, দুষ্ট পরামর্শে শলায় ছিল ননীর গুরু, ননীর গুরুগিরির জোরে সে আজকাল করিয়া খাইতেছে, এখন সে যাত্রার দলে থাকে। অজাতশ্মশ্রু-গুম্ফ কড়িই গতরাত্রের যাত্রার দলের সেই কোমল কিশোর।

ননীর সম্ভাষণের উত্তরে কড়ি কহিল—আর দাদা, না থাকা। কড়ি এখন

ফুটো-কাণা কড়িতে দাঁড়িয়েছে। এখন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে না গেলে বাঁচি। তারপর তুমি তো বেড়ে রয়েছ মাইরী! দিব্যি গোলা ভরা ধান, তকৃতকে ঝকৃঝকে ঘর দোর, এ যে রাজার হাল ওস্তাদ! কিন্তু কাল যে তোমায় যাত্রার আসরে দেখলাম না? তোমার মত গুণী ওস্তাদ লোক গানের আসরে ফাঁক?

ননী একটু ফিকা হাসি হাসিয়া বলিল—আর ভাই, যে কাজের ঝঞ্ঝাট, তার ওপর একা মানুষ···

কড়ি বেশ বঙ্কিম ভঙ্গিমায় বিজ্ঞতার ভানে, তরমুজের লাল বিচির মত পানের ছোপ-ধরা দন্তপাটী বিস্তার করিয়া কহিল—বাব্বারে, দ্রব্য গুণ যাবে কোথা? পয়সার নেশা সকল টানই ভুলিয়ে দেয়। রাজা হয়ে কালাচাঁদ পয়সার নেশায় রাধার মুখ শুদ্ধ ভুলেছিল। তা না হয় হল, কিন্তু তেমন মিষ্টি মিষ্টি চেহারাখানা এমন চোয়াড় করে ফেল্লে কেন বল তো? বাঁশী ছেড়ে অসি ধরার ফলই এই। এই বলিয়া সে তাহার স্বভাব কোমলকণ্ঠে গান ধরিল—

বাঁশী ছেড়ে অসি ধরা সে কি ব্রজধামে চলে,
কি রূপ কি হ'ল হরি, দেখ হে যমুনার জলে।

ননী হাসিয়া ধমক দিয়া কহিল—থাম্ থাম্!

কড়ি থামিয়া গেল, ননীর কথায় নয়, সহসা তাহার দৃষ্টি কোঠার দরজায় পড়িয়াছিল, বিস্ময় বিমুগ্ধ কড়ির গান আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল।

কোঠার দুয়ারে বিস্ময় বিস্রস্তবাসা অবগুণ্ঠনহীনা, দীপ্তনেত্রা গিরি; বিকশিত গন্ধমদির ফুলটির মত উন্মুখ কামনার বিহ্বলতা যেন মুখে চোখে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কড়ির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ননী গিরিকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—চুপ্, চুপ্, বউ রাগ করবে।

কড়ি কহিল—বউ? বেড়ে বউ হয়েছে মাইরী।

সুরের মোহ কাটিতেই গিরি আত্মস্থ হইয়া ঘোমটা টানিতে যাইতেছিল, কিন্তু কড়ি কহিল—ওকি ভাজবউ, ঘোমটা কেন? আমাকে দেখে ঘোমটা

চলবে না। আমি কড়ি! ননীদা আর আমি ভিন্ন নই, হরি-হর বল্লেই হয়। বলিয়াই আবার গান ধরিল—

ঢেকেছ কেন বদন চাঁদ নীরস বাস অঞ্চলে,
ফোটা ফুলে কি পাতারই ঢাকা মানে হে অলি-অঞ্চলে ?

কেমন একটা অস্বস্তি-ভরা আনন্দে চঞ্চল হইয়া গিরি বিস্রস্ত অঞ্চলে অবগুণ্ঠন টানিয়া ত্বরিতপদে খিড়কীর পথে বাহির হইয়া গেল।

ননী বলিল—ভাল কল্লি না, বউ বোধ হয় রেগে গেল।

কড়ি বলিল—কেন ?

ননী বলিল—বউ গান টান ভালবাসে না।

কড়ি আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ভালবাসে না!

তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল শ্রোত্রীবৃন্দের সর্ব্বাগ্রে উপবিষ্টা একটি কামনাব্যগ্র, বিহ্বল, অনবগুণ্ঠিত মুখ।

ননী প্রশ্ন করিল—এখান থেকে যাবি কোথা ?

চিন্তা-বিভোর কড়ি অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল—থাকব দু'দিন এখানে, ও-পাড়ার মামারা ধরেছে। হ্যাঁ, তারপর, দুপুর বেলা তুমি বাড়ীতে থাকবে ?

ননী কহিল—আলুতে যে একটা ছেঁচন দিতে হবে, তা—

ব্যগ্রভাবে কড়ি কহিল—না—না, কাজ কামাই করতে হবে না, আমি বরং সন্ধ্যেয় আসব। বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গিরি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কড়ি চলিয়া গিয়াছে, সে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কহিল—ও-ই কেষ্ট সেজেছিল গো। বেশ গলা কিন্তু, কে হয় তোমার ?

ননী বলিল—বন্ধু লোক, মামার বাড়ীর সম্পর্কে ভাইও হয়।

গিরি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—তা হ'লে বল আপন জন ?

ননী কহিল—তেমন আপন আর কি, রক্তের সম্বন্ধ তো নাই, গাঁ সম্পর্কে—

গিরি রুষ্টভাবে বলিল—গাঁ সম্পর্কে মুচি মিন্‌সেও আপন জন, আর একটা

সম্পর্কও আছে, পর আবার কি ক'রে হল? আপন বল্লে তো খেতে লাগছে না তোমাকে?

ননী একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল—না, না, পর্ তো বলি নাই, তবে রক্তের সম্বন্ধ কিছুই নাই। নইলে বন্ধু লোক, ভাই, আপনার বৈ কি!

গিরি প্রফুল্ল মুখে সপ্রশংস হাসি হাসিয়া কহিল—বেশ লোক বাপু…!

ফুলের কথা উঠিলে কুঁড়ির কথাও মনে পড়িয়া যায়, কড়ি 'বেশ লোক' বলিতেই ননীর সেই অতীতের অন্তরঙ্গ কড়িকে মনে পড়িয়া গেল, তাহার অন্তর গিরির কথায় প্রতিবাদ করিতে চাহিল, কিন্তু গিরির সম্মুখে সে কথা প্রকাশ করিতেও কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। সে ধীরে ধীরে কোদালখানি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গিরি কহিল—কোথা যাবে?

ননী কহিল—মাঠে।

সুরের রাজ্যে সঙ্গীতের মধ্যে তাল কাটিলে যেমন খট্ করিয়া মনে লাগে, ননীর কথাটিতে গিরির অন্তরে তেমনি তাল কাটিয়া গেল। কাজ, কাজ, কাজ! সমস্ত অন্তর বিষাইয়া উঠিল।

গিরি গুম্ হইয়া রহিল। মনে গুমোট, কিন্তু কানে গানের ঝঙ্কারের রেশ বাজিতেছিল।

শরতের মেঘের মত গুমোট ভাবটি কিন্তু তাহার স্থায়ী হইল না। পুঞ্জীভূত পুলকের উতল হাওয়ায় গুমোটের মেঘ কোথায় সরিয়া গেল; মনটি নির্ম্মল হইয়া উঠিল, তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা-উন্মুখ চিত্ত, সদ্যপ্রাপ্ত আনন্দের আস্বাদটুকু চর্বিত চর্বণের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্মরণ করিতেছিল, মনে জাগিতেছিল মান, অভিমান, সাধ্য সাধনা, প্রেমের বিহ্বলতা, গান, রূপ, সুর, সুন্দর।

ধ্যানে মন মানে কিন্তু পেট মানে না।

বসিয়া বসিয়া সুন্দরের ধ্যান করিতে পেট রাজী হইল না, বিষম বিরক্তিভরে গিরি উঠিয়া রান্না চড়াইল।

মনে ঝঙ্কার বাহিরে ঝঞ্ঝাট, বেশ খাপ খায় না; গিরির কাজও ভাল লাগিতেছিল না, আর না করিলেও নয়, সে কড়াটা দুম্ করিয়া উনানের উপর চাপাইতে উনানের খানিকটা ভাঙিয়া গেল, আগুন জ্বালিতে গিয়া নিভিয়া গেল, রান্না একটা পুড়িয়া গেল, একটা কাঁচা থাকিল। সহসা এই বেসুরের মাঝে একটি সুর বাজিয়া উঠিল—ওস্তাদ!

সেই অস্বস্তিভরা আনন্দে গিরি চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল, পুলকিত অস্বস্তিতে বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, হাতের চারিটি আঙ্গুল দিয়া অঙ্গুষ্ঠকে অনাবশ্যক জোরে সে মচকাইতে লাগিল।

কড়ি আসিয়া শূন্য অঙ্গনে দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া কহিল—কৈ ওস্তাদ কোথা? বাড়ীতে তো নাই। "গেল কোথা? ওস্তাদ!

কিন্তু বাড়ীতে নাই বলিয়া তাহার চলিয়া যাইবার কোন চেষ্টা দেখা গেল না, বরং রান্না-ঘরের অর্দ্ধমুক্ত দুয়ারের দিকে তাকাইয়া দিব্য রান্না-ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বসিয়া স্বেচ্ছায় কৈফিয়ৎ দিল—আচ্ছা একটু বসি, এখুনি আসচে সে।

তারপর ধীরে ধীরে হাতের বাঁশের বাঁশীটায় সুর তুলিল, বাদকের নৈপুণ্যে বাঁশী জাগিয়া উঠিল, ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কারে একটা মোহের রাজ্য গড়িয়া তুলিল। সহসা কড়ি বাঁশী থামাইয়া দুয়ারের পানে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল—একটু জল দাও তো ভাজবউ, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

তখন অর্দ্ধরুদ্ধ দুয়ার পূর্ণ মুক্ত,—আর মুগ্ধমুখী দীপ্তনেত্রা অবগুণ্ঠনহীনা গিরি সেখানে দাঁড়াইয়া।

সুর থামিয়া কথার আঘাতে চমক ভাঙিতেই গিরি ঘোমটা টানিতে গেল, কিন্তু কড়ি হাত জোড় করিয়া কহিল—ও কি ভাজবৌ, আবার ঘোমটা কেন, আমি কি তবে পরই হলাম?

আড়ি পাতিয়া ধরা পড়িলে তরুণীর মন যে সলজ্জ পুলকে ভরিয়া উঠে,

সেই পুলকিত লজ্জায় গিরি রাঙা হইয়া উঠিল, মৃদু হাসিয়া অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে কহিল—'না—না—'

কড়ি কথায় লজ্জা ভাঙিবার প্রয়াস না করিয়া কাজে ভাঙাইয়া দিল, কহিল—'তবে একটু জল দাও তো ভাই!'

শুধু জল কি দেওয়া যায়, বিশেষ আপন জন! গিরি আধ-ঘোমটা টানিয়া রেকাবীতে দুখানা বড় বাতাসা, তোলা নতুন সরফুলো গেলাসে জল নতদৃষ্টিতে বহিয়া আনিয়া নামাইয়া দিল।

কড়ি কড় কড় করিয়া বাতাসা দুইখানা চিবাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইয়া কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল—'দান তো হ'ল, দক্ষিণেটা দাও,—পান গো, পান!' বলিয়া গাহিয়া উঠিল—'ও তোমার হাতের মিঠে খিলি, খেলে বয়স বাড়ে না!'

গিরির অন্তরটা ছি-ছি করিয়া উঠিল, মনটা কেমন বাঁকিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু আপন জন—অসম্মান করা তো যায় না। লজ্জায় বিরক্তিতে আসিয়া পানের ঘরে পান লইতে লইতে ভাবিতেছিল,—নাঃ, যাইয়া কাজ নাই, আর উহার সম্মুখে বাহির হইব না।

কিন্তু দেখা দিব না বলিলে কি হয়, সে যদি দেখিতে সম্মুখে আসিয়াই হাজির হয় তো দেখা না দিয়া উপায় কি; নিজে ছাড়িলেও কম্‌লি যদি না ছাড়ে—তবে ছাড়ায় কি করিয়া?

কড়ি একেবারে পানের ঘরের দুয়ারে হাজির হইয়া মিনতি করিয়া মিষ্ট কণ্ঠে কহিল—'রাগ কল্লে ভাই ভাজবউ?—রাগ করো না ভাই, আমি একটু আমুদে লোক, আনন্দের রাজ্যের লোক কি না!'

'তাই, তাই,' গিরির অন্তর নিশ্চিন্ত নিশ্বাসে সায় দিয়া উঠিল—তাই, তাই, আনন্দের রাজ্য যে চঞ্চল, একটু উচ্ছল।

কড়ি উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই হাতটা গিরির সম্মুখে মেলিয়া দিয়া কহিল—'পান দাও।'

হাতে হাতে পান দিতে গিরির মনটা কেমন কেমন করিতেছিল, আবার ঐ আনন্দের রাজ্যের কৈফিয়ৎটা ব্যাপারটা একটু লঘুও করিয়া দিতেছিল; এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' সমস্যার সমাধান করিয়া লইল কড়ি নিজেই, সে নিজেই গিরির হাত হইতে পান লইয়া মৃদু আকর্ষণে টানিয়া লইয়া গিরির এই ঘটনার উপর কোন চিন্তা করিতে না দিয়াই কহিল—'ভাজবউ, তুমি নাকি গান ভালবাস না?'

প্রিয়কে অপ্রিয় নেত্রে দেখার অভিযোগ বড় কঠিন, সহ্য হয় না।

গিরি দীপ্ত প্রতিবাদে বলিয়া উঠিল—'মিছে কথা।'

কড়ি বলিল—'তোমার কত্তাই তো বল্‌ছিলো ভাই।'

গিরি সরোষে বলিল—'নরুকে মিন্সে নিজে যেমন, তেমনি সবাইকে ভাবে সংসারে।'

কড়ি কোন কথা না কহিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল। বাঁশী বাজিল, ছন্দে সুরে, কড়িতে কোমলে, ঝঙ্কারে। সঙ্গীত সর্ব্বদেহে-মনে শিহরণ-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া বাজিয়া চলিল।

গিরি তেমনি দাঁড়াইয়া—বিভোর, উচ্ছল।

বাঁশী থামিল।

কড়ি বলিল—'কই ওস্তাদ তো এলো না, আমি তবে আসি।'

গিরি বলিল, মৃদু কণ্ঠে আবেশের মধ্যে—'না, না, বাজাও, আরও বাজাও।'

আবার বাঁশী বাজিল; এবার হিল্লোলিত চটুল, লাস্যভরা গতিতে, মদির ছন্দে, সকল চিত্ত অধীর করিয়া শোণিতের ধারায় অগ্নিতপ্ত তরঙ্গের অনুভূতি ফুটাইয়া।

সহসা আত্মহারা গিরি একটা আকর্ষণে কড়ির বুকের উপর গিয়া পড়িল, কড়ি সুযোগ বুঝিয়া আত্মহারা বিহ্বলা গিরির হাত ধরিয়া আপন বুকের উপর টানিয়া লইল।

স্পর্শেরও রূপ আছে, অনুভূতি তাহা প্রত্যক্ষ করে; প্রখর গ্রীষ্মে হিম যখন কাম্য তখনও সর্পের শীতলস্পর্শে সুসুপ্তের সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়।

সুরের স্বপ্নে সুপ্তা গিরিও সর্পস্পৃষ্টার মত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। সবলে পাপক্ষীণ কড়িকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া হাতের কাছে পানের বাটাখানা লইয়া সজোরে কড়িকে আঘাত করিল, বাটাখানা গিয়া লাগিল কড়ির পায়ের গোছে, লাগিতেই কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

কড়ি একটা কুৎসিৎ কথা বলিয়া গিরিকে আয়ত্ব করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইতেই গিরি তরকারী-কোটা বঁটীখানা তুলিয়া কহিল—'বেরিয়ে যাও!'

সভয়ে কড়ি আহত পদেই খঞ্জ লম্ফে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল, সাধের বাঁশীটা তাহার পড়িয়া রহিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাঁশীটা উদ্ধারের চেয়ে সর্ব্ব-নাশীর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়াই সর্ব্ববাদীসম্মত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমানের কাজ; —বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান কড়ি।

গিরি বঁটীটা আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া মুখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল—

গিরির মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

কিন্তু মরণকে ডাকিলেই মরণ আসে না—, আসিলেও গল্পের কাঠুরিয়ার মত মানুষ তাহাকে বিদায় করিয়া বাঁচিয়া যায়।

মরণকে বরণীয় মনে হইলেও স্বহস্তে মরণের ব্যবস্থা আর পাঁচজনের মতই গিরিও করিতে পারিল না। শুধু দারুণ যন্ত্রনায় গিরি ছটফট করিতে লাগিল।

•

সহসা 'কৈ গিরি কৈ' বলিয়া মোট পুটুলী কাঁখে কয়জন নারী গৃহে প্রবেশ করিল; গিরি ফিরিয়া দেখিল তাহার মা ও আর কয়জন বাপের বাড়ীর আত্মীয় স্বজন।

দারুণ অশান্তির মধ্যে স্বজনের সান্ত্বনার আশ্রয় পাইয়া গিরি বাঁচিয়া গেল, সে ব্যাকুল আগ্রহে কহিল—'মা!'

মা স্নেহভরে কহিলেন—'হ্যাঁ মা, শ্রীধাম যাব দোল দেখতে, তাই পথে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

গিরি কহিল—'শ্রীধাম যাবে?'

সুরটি শুধু প্রশ্নের নয়, কল্পনার স্বপ্নেও জড়িত; তারপর আপনার সমবয়সী একটি বিধবার দিকে ফিরিয়া কহিল—'তুইও?'

সে হাসিয়া হাত নাড়িয়া কহিল—'হ্যাঁ লো, শুনে আসি, শ্যামের বাঁশী!'

গিরি স্বপ্নাবিষ্টার মতই প্রশ্ন করিল—সত্যি সেখানে বাঁশী বাজে?'

একজন প্রবীণা কহিল—'বাজে না? বাজে বৈ কি, কিন্তু সে কি সবাই শুনতে পায়? যার প্রাণ কাঁদে সে-ই পায়। আমরা কি আর—'

ঠোঁট চাপিয়া একটা হতাশার পিচ কাটিয়া সে কথাটার উপসংহার করিল।

গিরি ছোট মেয়েটির মত চপল চাঞ্চল্যে একটা বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল—'আমিও যাব।'

* * *

মা কহিল—'তা কি হয়, জামাই কি বল্‌বে?'

গিরি কাঁদিয়া, রাগিয়া, মরিবার ভয় দেখাইয়া শেষে জিতিল।

মা কহিল—'দেখ বাপু, জামাই বলে তো চলো।'

বেলা শেষে ননী বাড়ী ফিরিতেই গিরি বিনা ভূমিকায় কহিল—'আমি মায়ের সঙ্গে শ্রীধাম যাব।'

ননী চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—, 'সে কি? তা কি হয়?'

গিরি সরোষে কহিল—'কেন হবে না? আমি যাবই।'

ননী কহিল—'আমি একা মানুষ, এই ঘর দোর!'

গিরি বিপুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া কহিল—'তোমার পায়ে পড়ি গো, তোমার ঘরের বোঝা তুমি নাও, আমায় খালাস দাও, ছেড়ে দাও, মানা করো না।'

ননী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কত চিন্তা কত কথা মনে উঠিল, ডুবিল;

শেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল…তবে যাও।' বলিয়া সে ধীরে ধীরে খিড়কীর ঘাটে পা ধুইতে গেল। অন্য দিন হইলে কতক্ষণ তাহার পা ধোয়া হইয়া যাইত, কিন্তু আজ ঘাটের উপর রক্ষিত একখানি ইঁটে পা ঘষিতেই লাগিল, ঘষিতেই লাগিল।

বুকে তাহার কত যে ব্যথার কথা সে তো ভাষায় ফুটিবার নয়, দুঃখের ভাষাই যে দীর্ঘশ্বাসে, অশ্রুধারায় ; কয় ফোঁটা অশ্রু তাহার বুক বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল, শেষে সে দুঃখ রূপ পাইল ননীর অতীতের সুখের সাথী সব-ভোলানো গানে।

ননী বহুদিন পরে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু—
অনলে পুড়িয়া গেল।"

শেষ রাত্রে যাত্রীর দল বাহির হইবে ; গিরি মোট পুটুলী বাঁধিয়া আজ যাত্রীদের সঙ্গেই শুইয়াছে ; বড় আশায় সে বুক বাঁধিয়াছে—ব্রজের বাঁশী শুনিবে, সে শান্তি পাইবে, আঃ সে চির-পবিত্র চির-আনন্দময় !

কিন্তু তবু এই আনন্দের মধ্যে যেন ক্ষীণ রোদনের করুণ উদাস রাগিণী বাজে। গিরি ঘুমাইতে পারিল না।

কতক্ষণ পরে সবে তাহার ক্ষীণ তন্দ্রা আসিয়াছে, সহসা কানে আসিয়া বাজিল বাঁশীর সুর। মধুর ! মধুর ! এই সুরই সে যেন চায় ! আহা হা !

ব্রজের বাঁশীর সুর তাহাকে এতদূরেও ডাকিল !

মাঘী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার প্রায়-পূর্ণচন্দ্রের মদির জ্যোৎস্না জানালাটার ভাঙ্গা ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতেছিল ; সে পথশ্রান্ত সুষুপ্ত যাত্রীদলের ভিতর হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাতা শয্যাটির নির্দ্দিষ্ট অংশে একা শুইয়া ননী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, আজ তাহার মনের কথার ভাষাই ওই। তার মনে হইল,

তাহার পাতান ঘর জন্মের মত ভাঙ্গিয়া গেল! গিরির জন্য সে কি না করিয়াছে? বাঁশী ছাড়িয়াছে, গান ছাড়িয়াছে, উৎসব ভুলিয়াছে,—আপনার মর্ম্মখানি নিঙাড়িয়া গিরির পা দুটি রাঙাইয়া দিয়াও সে গিরিকে পাইল না! গিরি ধরা দিল না! গভীর বেদনায় তাহার মনটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল, সে ঘর খুলিয়া দাওয়ার উপর আসিয়া বসিল।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় সুন্দরী ধরণী, ননী যেন একটু আরাম পাইল, সে চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ঘাড় ধরিয়া উঠিতে ননী দৃষ্টি নামাইল।

চক্ চক্ করিতেছে ওটা কি?

কুড়াইয়া লইয়া দেখিল,—বাঁশী।

মদির জ্যোৎস্নায় নির্জ্জনে পাইয়া বেদনায় সান্ত্বনার আশা দিয়া বাঁশা তাহাকে যেন কহিল—'বাজাও, বাজাও!'

অতি মৃদু সুরে বাঁশী বাজিল, ক্রমে ক্রমে সুর উচ্চ হইতে আরো উচ্চে উঠিয়া বাজিয়াই চলিল।

সহসা কথার স্পর্শে চমকিয়া ননী ঘুরিয়া দেখিল, পাশে বসিয়া গিরি।

বাঁশী বন্ধ করিয়া অপ্রস্তুত ভাবে অপরাধীর মত ননী কহিল—'বাঁশীটা পড়েছিল তাই—'

গিরি সোহাগের রাশি ঢালিয়া ননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—'না, না, বাজাও বাজাও, আবার বাজাও!'

বাঁশী আবার বাজিল, বাজিয়াই চলিল।

সহসা গিরি হাত দিয়া ননীর মুখ হইতে বাঁশীটা নামাইয়া দিয়া পুলকে, কৌতুকে, আদরে, লজ্জায় মাখামাখি করিয়া কহিল—'আমি তো আর যাবো না।'

ননী ব্যগ্রভাবে কহিল—'যাবে না, সত্যি?'

সোহাগে সুখে এ-পাশ হইতে ও-পাশ পর্য্যন্ত ঘাড় নাড়িয়া গিরি কহিল—'না গো না!'

পুলকের ছোঁয়াচে ননীও বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল, পরম-তৃপ্তিতে, চরম-আগ্রহে গিরিকে বুকে টানিয়া তাহার হাস্যভরা ওষ্ঠাধর হইতে হাস্য রেখার ছাপ তুলিয়া লইল।

তারপর সকৌতুকে কহিল—'তীর্থের সাজ খুললে কি হয় জান তো?' গিরি তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কহিল—

"এই তো আমার তীর্থ মধুর, মধুর বংশী বাজে,
এই তো বৃন্দাবন।"

শাপমোচন

বিজ্ঞানের যুগে দেবীচরণের আকৃতির বিকৃতিকে বিধাতার খেয়ালের খুশী বলা চলে না। দোষ নাকি গিয়া পড়ে পিতা-মাতার উপর। কিন্তু বিধাতার খেয়ালই হউক, আর অপরাধ পিতা মাতারই হউক, দেবীচরণ ফলভোগ করে। লোমশ পশুর মত ছাই-রঙের দেহবর্ণ, অস্বাভাবিক লম্বা মুখ, তাহার উপর একটা চোখ অহরহ মিটমিট করে, আর একটা চোখ বিস্ফারিত, কে যেন চোখের উপরের কপালের চামড়াটা টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। শীর্ণ দেহ, কাঠির মত হাত পা, তাহার উপর চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, এক পায়ের শিরাগুলি নাকি অহরহ টানিয়া ধরিয়া থাকে।

বেলা তিনটা হইবে, দক্ষিণপাড়ায় দুর্গাপ্রসাদবাবুর চায়ের মজলিসটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; গড়গড়ার মাথায় ধুনুচির মত কল্কেটা আগ্নেয়গিরির মতই ধূমায়মান, হাস্যধ্বনিও প্রচুর উঠিতেছে। এই সময় সম্মুখের রাস্তায় দেবীচরণকে দেখা গেল। পরিধানে আধময়লা কাপড়, কিন্তু পরিপাটি কোঁচায় সুবিন্যস্ত, গায়ে একটি গলাবন্ধ কোট, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা, কাঁধে কনৃষ্টেবলদের মত একটি ঝোলা।

দুর্গাপ্রসাদের দাদা বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠাবান চিত্রশিল্পী, তিনি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দেশে আসিয়াছেন; চায়ের মজলিস তাঁহাকে লইয়াই গরম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেবীচরণকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, আরে, অদ্ভুত চেহারা তো!

দুর্গাপ্রসাদ মৃদুস্বরে বলিল, আমাদের কিশোরীদার ছেলে—দেবীচরণ। দেবীচরণের শ্রবণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ, কথাটা তাহার কানে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সে সহাস্যমুখে বৈঠকখানার উপর উঠিয়া বলিল, চিনতে পারছেন না কাকা-বাবু? কথাটা বলিয়াই সে শিল্পী শ্যামাচরণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া চাপিয়া বসিল।

শ্যামাচরণ তাহার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া লইতে লইতে বলিলেন—কেমন আছ?

হাসিয়া দেবীচরণ বলিল, আজ্ঞে, অস্তি কশ্চিৎ দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে মার্জ্জার শাবকের অবস্থা। ব্রাহ্মণগৃহের গরুও বলতে পারেন, খাদ্যাভাবে অস্থিপঞ্জরসার।

—কেন? তুমি তো সাবোর না চুঁচড়োয় এগ্রিকাল্‌চার না কি শিখেছিলে না?

দুই হাতের তালু উল্টাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীচরণ কহিল, বেশ! শুধু কৃষিবিদ্যা! শেখার আর অন্ত নাই, স্কুলে ফার্ষ্ট ক্লাস পর্য্যন্ত, চুঁচড়োর কৃষি, জমিদারী-সেরেস্তার খাতা লেখা, পোষ্টাপিসে পিওনীতে শিক্ষানবিশী, শিখলাম অনেক; কিন্তু গেল সব এই মদনমোহন রূপের জন্যে। দেখলেই মালিকের ভুরু কুঁচকে ওঠে। মুখে বলে, দরকার নাই; কিন্তু আমি বুঝি সব। বুঝলেন, অবশেষে শিখলাম জ্যোতিষবিদ্যা; কিন্তু সেখানে আরও বিপদ! লোকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, বলে, সাক্ষাৎ শনি, চোখ দেখছিস না!

মজলিসসুদ্ধ লোক তাহার কথায় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; শ্যামাচরণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন; তিনি কথাটাকে ঘুরাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন, বল কি! তা হ'লে তো অনেকগুলি বিদ্যে তুমি শিখেছ!

মজলিসের হাসির সঙ্গে দেবীচরণও প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছিল; সে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিদ্যেতে আমি বিদ্যে-মহাসাগর, কিন্তু তলা একেবারে পরিষ্কার, মণি মুক্তো দূরের কথা, ঝিনুকের খোলাও একটা জন্মাল না।

শ্যামাচরণ সত্যই একটু দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না, বলিলেন, তাইতো, তা হ'লে ঘরেই ব'সে আছ?

মাথা চুলকাইয়া দেবীচরণ বলিল, আজ্ঞে না, কতকগুলো শিশি বোতল নিয়ে টুংটাং ক'রে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি কোন রকম ক'রে।

বিস্মিত হইয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, শিশি বোতল নিয়ে?

—আজ্ঞে, জাত্যাভাবে ভবেৎ বৈষ্ণব—কর্মাভাবে চিকিৎসকঃ। আজকাল চিকিৎসক হয়েছি, ওষুধ বেচি!

এবার শ্যামাচরণের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বল কি ? চিকিৎসক !

—আজ্ঞে হ্যাঁ ; মানে-মানে যখন দিলে না লোকে, তখন প্রাণে না মারলে উপায় কি ? দেহ তো দেখছেন, চুরি-ডাকাতি করবার সামর্থ্য নাই, কাজেই বলের অভাবে কলে কাজ চালাচ্ছি।

দুর্গাপ্রসাদ এবার একটু হাসিয়া বলিল, দেবীচরণ একটা ওষুধ তৈরি করেছে দাদা, অদ্ভুত ওষুধ ; সে ব্যবহার করলে শরীর পুষ্ট হয়, কামদেবের মত রূপ হয়, কোকিলের মত কণ্ঠ হয় জাতিস্মরের মত স্মৃতি-শক্তি হয় আরও কি কি হয় বল না হে দেবী !

দেবী অপ্রতিভ হইল না, সে হাসিয়া বলিল—নাস্তি দোষ বিজ্ঞাপনে, বুঝলেন বাবু ! ওটা হ'ল আমার বিজ্ঞাপন। তবে হ্যাঁ ওষুধ আমার ভাল, বুঝলেন কিনা, আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীতে বিশুদ্ধ দেশীয় ভেষজের দ্বারা প্রস্তুত। অষ্টোত্তর শত রকমের গাছ-গাছড়া—অনন্তমূল ইত্যাদি—বুঝলেন কিনা, সেবনে ক্ষুধা হবে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, শরীরের পুষ্টি হবে, কান্তি উজ্জ্বল হবে, বুঝলেন কিনা ; তা কাকাবাবু, আপনি এক বোতল ব্যবহার করে দেখুন। মূল্য নাম মাত্র—আড়াই টাকা। তা সে আপনার কাছে আর কি ? শুনতে তো পাই আপনি একজন মস্ত বড় চিত্রকর—খ্যাতি কত ! বুঝলেন কিনা ; সেবার গেলাম মুর্শিদাবাদে রাজবাড়ি ; দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের খরচ প্রয়োজন—

সবিস্ময়ে শ্যামাচরণ বলিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর বুঝলেন কিনা, মনে মনে—

আবার বাধা দিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, কেন ? প্রথম স্ত্রী তোমার—

—আজ্ঞে, সেদিকে আমি ভাগ্যবান, তিনি খালাস পেয়েছেন। তারপর বলি শুনুন—মনে মনে অনেক প্রণিধান করলাম, ক'রে একখানা কাপড়-কাচা সাবান বের ক'রে যাকে বলে আপাদ-মস্তক ঘর্ষণ ক'রে খালি পায়ে, খালি গায়ে, গলায় একটা ন্যাকড়ার ফালিতে একটা চাবি বেঁধে গিয়ে উপস্থিত হলাম

জোড়হাত ক'রে। সভায় তখন ঘোর মজলিস, দেখি কাকাবাবুর নাম হচ্ছে। মহারাজ বলছেন,—হ্যাঁ, চিত্রকর বটেন শ্যামাচরণবাবু! ভাবলাম, বলি, হুজুর, তিনি আমার কাকা হন। পরক্ষণেই লোভ সম্বরণ করলাম, না, তাঁর মাথা হেঁট হবে আর আমার ভাগ্যেও হয়তো শিকের দড়ি শেকল হয়ে যাবে, কোন মতেই আর ছিঁড়বে না।

দেবীচরণ একবার নীরব হইয়া চারিদিক দেখিয়া লইল; দেখিল, অন্য সকলের মুখে কৌতুকস্মিত হাস্যরেখা সুপরিস্ফুট, কিন্তু শ্যামাচরণ গম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। সে নীরব হইয়া গেল।

—তারপর? সাহায্য কি পেলে?—একজন প্রশ্ন করিল।

হাতের উপর হাত দিয়া মৃদু তালি দিতে দিতে দেবীচরণ বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিল, তা দিয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকা। বললাম, মাতৃবিয়োগ হয়েছে, ব্রাহ্মণের ছেলে। মহারাজের দয়া হয়ে গেল আর কি!

গম্ভীরভাবেই শ্যামাচরণ বলিলেন, বিয়েটা হ'ল কোথায় হে?

—জায়গা অবিশ্যি খুব ভালই—আম, কাঁঠাল, দধি, দুগ্ধ প্রচুর। গঙ্গার তীর, শীতল জায়গা, মুর্শিদাবাদ জেলা—নবাবী দেশ। শ্বশুরও পণ্ডিত লোক, হাসছেন কি, বেশ মান-খাতির আছে গো! মশায়, দানের বাসন কত গো! একটা ঘর বোঝাই।

শ্যামাচরণ বুঝিলেন,—একটা চাতুরি খেলিয়া মেয়েটির সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে। তিনি একটু কঠিন হাসি হাসিয়া বলিলেন—ঘটকচূড়ামণিটি কে হে? ঘটকালি করলে কে?

দেবী হাসিয়া বলিল,—অ্যাই দেখুন, কাকাবাবু কি বলছেন দেখুন! বিজ্ঞাপনে বিবাহের যুগে ঘটকের দফাই যে ইতি শেষঃ। ও আপনার ঘটও ভেঙেছে, কচুও দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত, বাকি আছে চূড়ামণি—তা সেটুকু আর থাকবে না, ওই বেতারে বিয়ে আরম্ভ হওয়ার অপেক্ষা আর কি!

মজলিসসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবার শ্যামাচরণের মুখেও

হাসি দেখা দিল। দেবীচরণের রসিকতায় তিনি সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, বলিলেন, তাই তো দেবীচরণ, তুমি যে এমন রসিক, তা তো জানতাম না!

—আকার দেখে অনুমান করতে পারেন না বাবু? আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমার নিজেরই হাসি পায়। বিধাতা বেটাকে বখশিশ করতে ইচ্ছে হয়।

এ কথাটায় অন্য সকলে হাসিল, কিন্তু শ্যামাচরণ আবার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। দেবীচরণের চক্ষু আকারে দেড়খানি হইলেও তীক্ষ্ণতায় বোধ করি, সাড়ে চারখানির সমতুল্য—সেটুকু ভাবান্তরও তার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল—আবার বিয়ের কথা যদি শোনেন, তবে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। বুঝলেন কাকাবাবু, ও দোষ কারুরই নয়, ঘটক তো ছিলই না, আর দোষ আমার শ্বশুরেরও নয়। দোষ আমার আর সেই তার; মানে, বুঝলেন কিনা, ওই সীতা সাবিত্রীর বাচ্চাটির। যাকে বলে, স্বখাত সলিল। আমি কন্যে চাক্ষুষের সময়, যাকে বলে বাঁচিয়ে, মানে—ব'লে ক'য়ে সেঙা করা, তাই করেছি।

—আরে, তুমি নিজেই কনে দেখতে গিয়েছিলে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বয়ং একক।

—কেন তোমার জ্যেঠা? তিনি আছেন তো?

—আছেন মানে! দিন দিন ফুলছেন, ইয়া—বিরাট পুরুষ, ওঁর আর বিনাশ নেই। প্রায় বিশ্বরূপের কাছাকাছি, কোমরে এখন কাছি বেঁধে কাপড় রাখতে হয়।

—বল কি, এত মোটা হয়েছেন? তা মোটা মানুষের নড়াচড়া একট কষ্টকর হয় বটে।

—অ্যাই, কাকাবাবু আবার বলছেন কি দেখ! জ্যেঠা গতিতে আমার ঐরাবত; উচ্চৈঃশ্রবা রেসে হেরে যায়। আজকাল আবার মামীর সম্পত্তি

পেয়েছেন একগণ্ডা দুকড়া দুক্রান্তি একদন্তী জমিদারী স্বত্ব। দৈনিক ভূমি কম্পিত ক'রে দপ্তর বগলে দশ বারো মাইল হেঁটে খাজনা আদায় ক'রে আসছেন। তা আমি অবিশ্যি বলেছিলাম জ্যেঠাকে, যে জ্যেঠা, চল আমার সঙ্গে। বেশ লজ্জিত হয়ে বিনয় ক'রেই বললাম। তা জ্যেঠার আমার আর কিছু থাক আর না থাক, জ্যাঠামি অনেকটুকু আছে কিনা! বললে, তা হলে একখানা ফরাসডাঙ্গা না হোক, ধোলাই ধুতি কিনে দে আমাকে, আর ইণ্টারক্লাসে নিয়ে যেতে হবে, ও কাঠের বেঞ্চিতে ভিড়ে আমি যেতে পারব না। ঠ্যাটামি বরং সহ্য হয় বাবু, কিন্তু জ্যাঠামি আদবে আমার বরদাস্ত হয় না। আমি আর কিছু না ব'লে, জয় বাবা শুণ্ডহীন সিদ্ধিদাতা ব'লে জ্যেঠাকে একটি প্রণাম ক'রে একাই চ'লে গেলাম।

অকস্মাৎ সচকিত হইয়া সে বলিল, কে গেল? পোষ্টমাষ্টার নয়?

পথিকটি তখন পথের সে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, দেবীচরণ দাওয়ার উপর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, হু, সেই ঘুঘু মশায়ই বটেন। বুঝলেন, এখানে এক সম্বন্ধ বার করেছেন, রোজ কুটুম্বিতা ক'রে জলখাবারটি সেখানে সারা চাইই। যাই, আমি আবার ওষুধের দাম পাব, দেখি।—বলিতে বলিতেই সে ঝোলা খুলিয়া একটি বোতল বাহির করিয়া নামাইয়া দিল।

—খেয়ে দাম দেবেন কাকাবাবু। সস্তা ইনস্টলমেণ্ট—চার আনা সপ্তায়, আড়াই মাসে শোধ। নগদ দিলে চার আনা কমিশন।

শ্যামাচরণ হাসিলেন। কে একজন বলিল, বাঃ, বিয়ের গল্পটা ব'লে যাও।

—মানে, গল্প আর কি, চোস্ত সাদা কথায় মেয়েটিকে আমি বললাম, বাপু, এই দেখছ আমার রূপ, আর গুণের কথা বেগুন না হ'লেও কচু বটে, খেতে ভাল লাগে না, নাড়লে ঘাঁটলে সুড়সুড়ি লাগে: আর অবস্থার

কথা কি বলব, লোকের দশ অবস্থা হয়, আমার আবার দশের আগে দশমিক, মাথায় পৌনপুনিক। স্রেফ মোটা ভাত আর মোটা কাপড়; শেমিজ না, ক্রীম না, স্রেফ নারকেল তেল। পছন্দ হয় তো বল বাপু, না হয় তো তাও বল। তা বুঝলেন কিনা, মেয়েটি এক দিকেই ঘাড় নাড়লে, সে ঘাড় আর অন্য দিকে গেল না। আমি যাই, মাষ্টার আবার অন্য দিকে পথ ধরবে। রাম ঘুঘুরে বাবা!

শ্যামাচরণ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, বউমাটি দেখতে শুনতে কেমন হে?

অত্যন্ত লজ্জার সহিত দেবী বলিল আমার তো আজ্ঞে, দেড়খানা চোখ, ওই একরকম আর কি। সে হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গাপ্রসাদ বলিল, দেবীর বউ খুব সুন্দরী হয়েছে, তা সে কথা ও কিছুতেই বলবে না।

শ্যামাচরণ বলিলেন, ওদের দুজনের ছবি আঁকতে দিলে আমি আঁকি, 'দি বিউটি অ্যাণ্ড দি বীষ্ট'! অবশ্য দেবীকে আরও খানিকটা কুৎসিত করতে হবে।

দুর্গা বলিল, বলে দেখ না। টাকাকড়ি পেলে হয়তো রাজি হতে পারে।

শ্যামাচরণ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঔষধের বোতলটা লইয়া একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর ছিপিটা খুলিয়া সেটাকে উপুড় করিয়া সমস্ত ঔষধটুকু নিঃশেষে মাটিতে ঢালিয়া দিলেন।

* * *

'খুব সুন্দরী' কথাটা অতিরঞ্জন; সংসারে যে রূপ দেখিতে গেলে মানুষ বাধা পায়, সে রূপের মহিমা বাড়িয়া উঠে মানুষেরই কল্পনায়। দেবীচরণের বাড়িতে পর্দার বড় কড়াকড়ি ব্যবস্থা। বধূটি কদাচিৎ বাড়ির বাহির হয়, তাও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মেয়েটি নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে। দেখা যায় শুধু হাতের ও পায়ের আঙুলগুলি; গৌরবর্ণ ঈষদ্দীর্ঘ আঙুলগুলি মানুষের

মনের রঙে ডুবিয়া তুলিকার কাজ করে। তবে খুব সুন্দরী না হইলেও ভামিনী শ্রীমতী মেয়ে, নিখুঁত রূপ না থাকিলেও একটি রমণীয় শ্রী আছে।

ভামিনী স্বামীর সংসারে একা মানুষ, বাহিরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়াই সে দাওয়ায় রান্না করিতেছিল। গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া দেবীচরণ সন্তর্পণে দরজাটি অল্প খুলিয়া সব দেখিয়া লইল; নিবিষ্টমনে ভামিনী রান্না করিতেছে। সন্তর্পণেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী ভামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভামিনী সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনটি দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিল। এবার সশব্দে হাসিয়া দেবীচরণ দাওয়ার উপরের তক্তাপোষটায় বসিয়া বলিল, তুমি তো ভয়ানক চতুরা!

ভামিনী রান্না ছাড়িয়া উঠিল। স্বামীর হাত পা ধুইবার জন্য জল ও গামছা আনিয়া সম্মুখে নামাইয়া দিল, একটি কথাও বলিল না, মাথার অবগুণ্ঠন এতটুকু অপসারিত করিল না। এমনই ভামিনীর অভ্যাস। দশটা কথার একটা জবাব দেয়। দেবী আবার বলিল, তুমি তো দেখি ভয়ানক চালাক!

ঘোমটার ভিতর হইতেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে ভামিনী বলিল,—অ্যাঁ?

—আমি এসে দাঁড়ালাম এত চুপি চুপি, তুমি বুঝলে কেমন ক'রে বল তো?

—ছায়া দেখে। লম্বা ছায়া পড়ল যে। —ভীরু শিশুর মত ভামিনী উত্তর দিল।

দেবীচরণ বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা হলে তুমি বোকা সেজে থাক। নইলে ধূম থেকে বহ্নি, ছায়া থেকে কায়া—এ উপলব্ধি তো সহজ নয়!

ভামিনী ঘোমটার ভিতর হইতেই প্রশ্ন করিল,—অ্যাঁ?

—কিছু না; বলছিলাম, তরকারির ডালায় কচু আছে? থাকে তো দগ্ধ কর, ভক্ষণ করব।

ভামিনী কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত অপেক্ষা করিয়া ত্রস্তভাবে রান্নাশালের

দিকে চলিয়া গেল, রান্নায় পোড়া গন্ধ উঠিয়াছে। দেবী ঝোলার ভিতর হইতে আপনার ঔষধগুলি বাহির করিতে বসিল। ঔষধের বোতলের সঙ্গে বাহির হইল একটি কাগজে মোড়া প্যাকেট। শ্যামাচরণ নগদ টাকাই তাহাকে দিয়াছেন। সেই টাকায় ফিরিবার সময় দেবীচরণ ভামিনীর জন্য একখানি শাড়ি কিনিয়া আনিয়াছে। 'বনহরিণী' শাড়ি, শাড়ির পাড়ে চকিত হরিণীর দল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। প্যাকেটের কাগজখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সহসা ঘৃণায় আক্রোশে কুৎসিত মুখখানা বীভৎস করিয়া তুলিয়া দেবীচরণ বলিয়া উঠিল—পরিবারের সহোদর সব! আমার স্ত্রী যেমনই হোক, তাতে তোদের খোঁজ কেন, শুনি? কমিশন বাদ না দিয়েই পুরো আড়াই টাকা নগদ।

কিন্তু ভামিনীর কি দোষ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবীচরণ অবগুণ্ঠনাবৃতা ভামিনীর দিকে চাহিল, এখনও সেই দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অদ্ভুত! সংজ্ঞা নাই, সাড়া নাই, রক্তমাংসের পুতুল একটা। দেবীচরণের সাধ্য আর কতটুকু, কিন্তু তবুও তো দেবীচরণের ত্রুটি নাই! রঙিন কাপড়, সায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, পাউডার, স্নো, ক্রীমে ভামিনীর বাক্স ভরিয়া দিয়াছে। দেবীচরণ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিল, এগুলো তুলে রাখ দেখি।

ভামিনী উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। একে একে বোতলগুলি তুলিয়া রাখিয়া শেষে কাপড়খানা হাতে তুলিয়া একবার শুধু পাড়টা দেখিল, তারপর সেখানিকেও ঘরে রাখিয়া দিয়া পুনরায় রান্নাশালে ফিরিয়া উনানে কড়াটা চাপাইয়া দিল।

দেবীচরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, সে বলিল—দেখ।

ভামিনী মুখ ফিরাইল। দেবী বলিল—তোমার বাবা আমার পায়ে ধ'রে তোমার পিঠে ফুল গঙ্গাজল দিয়ে, যাকে বলে উচ্ছুগ্যু ক'রে তোমাকে দান করেছে, আমি তোমার পায়ে ধ'রে আনতে যাই নি, বুঝেছ?

ভামিনী নিস্পন্দ নির্ব্বাক, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সে শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রূঢ়স্বরে দেবী বলিল—শুনছ?

মৃদুস্বরে উত্তর হইল,—হ্যাঁ।

—তবে? তবে আমাকে দেখে ঘোমটা কেন তোমার? খোল, ঘোমটা খোল।

ভামিনী ঘোমটা খুলিয়া দেবীচরণের মুখের দিকে চাহিল। সুন্দর ভামিনীর দুইটী চোখ, তেমনই সুন্দর তাহার দৃষ্টি। দেবীর সমস্ত অন্তরখানি পরম স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে নিজেই উঠিয়া গিয়া সস্নেহে ভামিনীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—কাপড়খানা পছন্দ হয়েছে?

ভামিনী প্রশ্ন কহিল,—পাড়ে ওগুলো কি? ছাগল?

হাসিয়া দেবী বলিল—না সখি, তোমার মত যাদের চোখ, ওরা হ'ল তাই।

—গরু?

হা হা করিয়া হাসিয়া দেবী যেন ভাঙিয়া পড়িল—তোমার কি গরুর মত চোখ নাকি? এমনই গোলাকৃতি?

অপ্রস্তুত হইয়া ভামিনী বলিল—না।

—হরিণ হরিণ! আজ কাপড়খানা পরবে, বুঝেছ? আজ শুক্রবার, 'সোম শুক্রে পরে শাড়ি, ধন হয় তার আড়ি-আড়ি'। মেলাই টাকা হবে আমাদের। সন্ধ্যাবেলা রান্না সেরে নিয়ে গা ধুয়ে ফেলবে, সুগন্ধ তেল দিয়ে চুল বাঁধবে, তারপর সাবান দিয়ে মুখখানি পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে স্নো মাখবে; মেখে কাপড়খানি প'রে ফেলবে। বুঝেছ?

ভামিনীর মুখখানি এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দীপ্তি দেখিয়া দেবীর অন্তর মুহূর্ত্তে উত্তাপে আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, সে তাহার লোমশ দীর্ঘ হাত দুখানি প্রসারিত করিয়া ভামিনীকে বুকে টানিয়া লইল। ভয়ে ভামিনীর

চোখ তখন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, সংজ্ঞাহীন কাঠের পুতুলের মতই আড়ষ্ট সে, মুখখানা শবের মত বিবর্ণ।

দেবীও সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে বলিল, ঘোমটাটা টান; শুনতে পাচ্ছ না?—বলিয়া নিজেই তাহার অবগুণ্ঠন আবক্ষ টানিয়া দিল। গান! ভদ্রলোক গান গায় পাড়ার মধ্যে, উপরের জানালার ধারে বসে! মুখুজ্জেদের ডেঁপো ছেলেটা এই দ্বিপ্রহর বেলায় জানালার ধারে বসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

—হ্যাঁ, রান্না-বান্না তুলে ঘরে রাখ। আমি জল নিয়ে আসি।—বলিয়া দেবীচরণ প্রকাণ্ড দুইটা বালতি লইয়া বাহির হইয়া গেল। ভামিনীর স্নানের জল। উঠানের কোণে তালপাতা দিয়া ঘেরা একটুকরা বাঁধানো জায়গা, ভামিনীর স্নানের ঘর।

* * * *

প্রাতঃকালে দেবীচরণ চলিয়াছিল রোগী দেখিতে। সঙ্গে দুই তিন জন নিম্নজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ; তাহারা কবিরাজকে ডাকিতে আসিয়াছে। ময়দার দোকানে গোঁসাইজী বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল, সে অকস্মাৎ দেবীচরণকে দেখিয়া বেশ ব্যগ্র হইয়া উঠিল, বলিল,—দেবীচরণ যে, অ্যাঁ! চলেছ কোথায় হে?

দেবীচরণ বাহিরে আর একটি মানুষ, সে তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ধন্বন্তরি কলে চলেছেন, প্রভু।

গোঁসাইজীও রসিক ব্যক্তি কিন্তু আজ আর তিনি রসিকতা করিলেন না। পরম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তা বেশ বেশ; কল-টল পাচ্ছ তা হ'লে আজকাল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রীয়াং চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্য। কিসে যে কি হয়! প্রভু! মাটি খুড়ে হ'ল না, কাগজে-কলমে হ'ল না, দাসত্ব তো নৈব নৈব চ। অবশেষে দেখি. শিশি-বোতলের মধ্যে মা-লক্ষ্মী লুকিয়ে আছেন। তা চলি এখন।

গোঁসাইজীও উঠিলেন, বলিলেন, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই খানিকটা। কাজ আছে।

শির-টানা পায়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দেবীচরণ বেশ দ্রুতই চলিয়াছিল। গোঁসাইজী বলিলেন,—আরে, তুমি যে ঘোড়ার মত ছুটেছ হে।

—ওই দেখুন, তবু সব মক্কেলরা বলে, ঘোড়া কিনুন 'কবরেজ মশাই।'

গোঁসাইজী বলিলেন, আচ্ছা দেবীচরণ, তুমি যে চিকিৎসা কর, তা পড়াশুনা করেছ তো?

—অনন্তপারং—

বাধা দিয়া গোঁসাইজী বলিল, পরিষ্কার বাংলা ক'রে বল বাপু, ও অনুস্বার বিসর্গ বাদ দিয়ে বল।

হাসিয়া দেবীচরণ বলিল,—আজ্ঞে, চলে না গোঁসাইজী, চলে না! রোগীর বাড়ির লোকদের উপসর্গের মহৌষধ হ'ল ওই অনুস্বার এবং বিসর্গ। পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করছেন, তা সত্যই আপনাকে বলি, আরম্ভ করেছিলাম কুইনিন ম্যাগ্‌সাল্‌ফ নিয়ে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে পড়েছি এবং এখনও পড়ি, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ডাক্তারিশাস্ত্র—দুইই পড়ি।'

—ভাল ভাল। এক মিনিট দাঁড়াও দেখি তা হ'লে। ওরে, চল চল, তোরা এগিয়ে চল, দেবী যাচ্ছে।

দেবীচরণের সঙ্গে লোক কয়টী একটু অগ্রসর হইতে গোঁসাই বলিল, আচ্ছা, স্ত্রীরোগের চিকিৎসা—জান তুমি?

গোঁসাইজীর মুখে স্ত্রীরোগের চিকিৎসার কথা শুনিয়া দেবীচরণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল,—আজ্ঞে না; আমি এই সামান্য জরজালার চিকিৎসাই করি গোঁসাইজী; ওসব আমি জানি না।

গোঁসাই কূটকৌশলী বিচক্ষণ লোক, দেবীচরণের এই গম্ভীর কণ্ঠস্বরের উত্তর সে বিশ্বাস করিল না। দেবীচরণের মুখের উপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, তুমি জান।

কাতর মিনতিতে হাতজোড় করিয়া দেবী বলিল, আমাকে মাফ করুন গোঁসাইজী। সত্যই বলছি, আমি জানি না। সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

বিস্ফারিত চোখে ইঙ্গিত করিয়া একখানি হাত দেবীর মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া গোঁসাই বলিল,—পঞ্চাশ।

—আজ্ঞে না। দেবীচরণের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

—এক শো।

আমাকে মাফ করুন গোঁসাইজী। আপনার পায়ে ধরছি আমি। দেবীচরণ ভয়ে এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোঁসাই বলিল, কেউ জানতে পারত না হে, কাকে কোকিলে না। মিছে ভয় করলে তুমি। তা যাক, কিন্তু সাবধান, বুঝেছ?

রেহাই পাইয়া দেবীচরণ যেন বাঁচিয়া গেল, সে বিবর্ণ মুখেই পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে না। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে তা হ'লে। দেখবেন আপনি। আপনাকে—আপনি—মানে—। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া প্রলাপের মত সে বকিতে আরম্ভ করিল।

আবার পাছে গোঁসাইজীর সহিত দেখা হইয়া যায়, সেই ভয়ে রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় এক জনবিরল গলি-পথ ধরিয়া সে বাড়ি ফিরিল; কিন্তু মনে মনে তাহার কৌতুহলের আর সীমা ছিল না। এই ব্যাধিগ্রস্থ স্ত্রীলোকটি কে? গোঁসাই তো বহুবল্লভ; তাহার উপর জাতিকুলশীল সব মজাইয়া তাহার অভিসার। সম্প্রতি ছুতারদের গলিতে নাকি প্রভাতে তাহার পদচিহ্ন দেখা যায় বলিয়া লোকে অনুমান করে। ছুতারদের বিধবা মেয়ে দাসী—দুর্গাদাসীর দুয়ারে তাহার করপদ্মের ছাপ পাওয়া যায়। দেবীচরণের মনটা কুৎসিত আনন্দে ভরিয়া উঠিল, ধান্যলুব্ধ ঘুঘু এইবার জটিল জালে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, একটা ঢাক কাঁধে করিয়া কথাটা সে গ্রামময় ঘোষণা করিয়া

বেড়ায়। আনন্দের আবেগে সে অভ্যাস মত সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে আপন মনেই পাগলের মত হাত পা নাড়িয়া নানা ভঙ্গি করিয়া উঠিতেছিল।

বাড়ি আসিয়াই সে তাহার ধন্বন্তরি ঔষধালয়ের দুয়ারটি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। খিলখিল হাসি! বাড়িখানা যেন সে হাসির ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে! তাহার বুকে যেন খিল ধরিয়া গেল। ভামিনী হাসিতেছে! ভামিনী হাসিতেছে। ভামিনী হাসে, হাসিতে জানে কিন্তু সে হাসি হাসায় কে? রক্ত যেন সনসন করিয়া মাথার দিকে উঠিয়া চলিয়াছে!

দরজার গায়ে একটা লম্বা ফাটল, সেই ফাটলে দেবী চোখ পাতিল। ও, দুই সখীতে আনন্দ হইতেছে! দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু অদ্ভুত, ভামিনী সেই বনহরিণী শাড়িখানা আধুনিক রুচি অনুযায়ী ঘের দিয়া পরিয়াছে, পিঠে বেণী, কানে ও দুটা কি? ঝুমকোই তো মনে হইতেছে। ঝুমকো কোথা পাইল ভামিনী? ভামিনীর সম্মুখেই দেবীর জ্যেঠতুত বোন মণি বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ভামিনী মণিকে বলিল, টুং টাং মিসিন টান। বুঝতে পারতা নেই বাঙালী লোক, আমি মেমসাহেব আছে। এম-এ, বি-এ পাস করা হ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে মণি এবং ভামিনী উভয়েই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। কিশোরী কণ্ঠের খিলখিল হাসি! সে হাসিতে বাস্তব দিবালোকও যেন স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া ভামিনী বলিল, এইবার ভাই তুমি রাক্ষসী সাজ। .

—না ভাই, আগে তুমি নাচ।

—আচ্ছা! ভামিনী ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া হাত দুইটি তুলিয়া ধরিল, তারপর দুই চারি পা ধীরে ধীরে ফেলিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শিশুরা যেমন নৃত্যের অক্ষম অনুকরণ করে, তেমনই খানিকটা নাচিয়া ভীষণ

বেগে খানিকটা ঘুরপাক দিয়া দিল। নৃত্য শেষ করিয়া সে মণির কাছে হাত পাতিয়া বলিল, বকশিশ, বাবুলোক।

মণি বলিল, লবডঙ্কা লেগা, লবডঙ্কা ?

দেবীচরণ আর থাকিতে পারিল না, সে দরজা খুলিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, বকশিশঠো হামি দেগা।

মুহূর্ত্তে অবগুণ্ঠনহীনা ভামিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, বারবার কাপড়ের আঁচল টানিয়া মাথায় অবগুণ্ঠন দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; আঁটসাঁট করিয়া ঘের দিয়া পরা কাপড়ের আঁচল আসিল না। ভামিনী ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল। মণিও ভয়ে যেন শুকাইয়া গিয়াছে। দেবীর কঠোর শীলতার অনুশাসনের কথা তো তাহার অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু দেবীর অন্তর আজ ভরিয়া উঠিয়াছে। ভামিনীর এমন কৌতুকময়ী লাস্যময়ী রূপ সে কখনও দেখে নাই। সে মণিকে বলিল, কি বকশিশ দিতে হবে রে মণি, নাচওয়ালীকে ?

মণি শঙ্কিত হইলেও—ভগ্নী, তাহার উপর সে তাহার পোষ্য নয়, সে এবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, এই দেখ দাদা, মার-ধোর কর তো ভাল হবে না কিন্তু, আমি কখনও আর তোমার বাড়ি মাড়াব না।

—যা গেল। মার-ধোরের কথা কোথায় পেলি ?

মণির কথা তখনও শেষ হয় নাই ; সে বলিল, আহা বেচারা, আমার নতুন ঝুমকো দেখাতে এলাম তো বললে, আমায় একবার পরিয়ে দাও না ভাই। তাই ঝুমকো প'রে আমরা দুজনে একটু আমোদ করছি, তা না—এলেন আমার আয়ান ঘোষ একেবারে রক্তচক্ষু হয়ে !

আচ্ছা আচ্ছা, আমি যদি ঝুমকোই গড়িয়ে দিই ওকে ?

কই, দাও দেখি, তবে জানি হ্যাঁ ? তা না, ভাত দেবার সোয়ামী নয়, কিল মারবার গোঁসাই।

দেবীচরণের মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল; সে বলিল, দিতে পারি, তুই কই একবার রাক্ষুসী সেজে দেখা দেখি। সেটা তো দেখা হ'ল না।

মণি লজ্জা করিল না। তাহার যেন জেদ চাপিয়া গিয়াছে, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাপড়ের আঁচলে গাছ-কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, দেখ, তিন সত্যি কর।

হাসিয়া দেবী বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—উঁহু। কি হ্যাঁ? বল, ঝুমকো দোব, ঝুমকো দোব, ঝুমকো দোব।

দেবীচরণ তাই বলিল। মণি কালো মেয়ে, কিন্তু চোখ দুইটি বড় বড়, মাথায় চুলও একরাশ। মাথার চুল এলাইয়া অল্প কয়েক গাছা মুখের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তারপর চোখ দুইটা যথাসম্ভব উগ্র ও বিস্ফারিত করিয়া, হাঁ করিয়া হাত দুইটা নাড়িতে নাড়িতে দেবীর দিকে ছুটিয়া আসিল। সত্যই ভয়ঙ্করী রূপ। দেবী হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমাদের বউকে—বউকে—ঘরের মধ্যে।

মণি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়াই কিন্তু চীৎকার করিয়া উঠিল, জল জল! দাদা, বউয়ের ফিট হয়ে গেছে, প'ড়ে রয়েছে মেঝের ওপর।

মণির রাক্ষসী মূর্ত্তির আতঙ্কে নয়; দেবীচরণের উগ্রমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভামিনী সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়াছিল।

চোখে মুখে জল দিতেই অবশ্য চেতনা হইল। মণি পুলকিত কণ্ঠে বলিল, তোর জন্যে আজ ঝুমকো আদায় করেছি ভাই।

আশ্চর্য্য! ভামিনী আবার যেন প্রাণহীন পুতুল হইয়া গিয়াছে। উচ্ছ্বাসের চাঞ্চল্য দূরের কথা, স্পন্দনও যেন অনুভব করা যায় না। দেবীচরণ বলিল, ওকে শুয়ে থাকতে বল মণি, দুর্ব্বল শরীর। রান্না আমিই করছি।

উনান ধরাইতে ধরাইতে সে প্রশ্ন করিল, তোর ঝুমকোতে খরচ পড়ল কত রে মণি?

মণি বলিল, ঝুমকো তোমার কুড়ি টাকাতেও হবে। আমারটা একটু ভারী আছে তো, সাতাশ আটাশ লেগেছে আমার।

নীরবে উনানে কাঠ দিতে দিতে ভাবিতেছিল, গোঁসাইয়ের এক শত টাকা—ত্রিশ টাকা গেলেও সত্তর টাকায় অন্তত যদি একজোড়া রুলি হয়।

—আমি চললাম দাদা, ভাত নামাবার সময় আমাকে বরং ডেকো।

—অ্যাঁ? দেবী মুখ তুলিয়া মণির দিকে চাহিল।

—বাবা রে! চোখ দুটো কি হয়েছে তোমার দেবীদা! একেবারে লাল কুঁচ, দেড়খানা চোখ যেন আড়াইখানা হয়ে উঠেছে। এত ক'রে ঝুঁকে ধোঁয়ায় ফুঁ পেড়ো না।

* * * * *

সত্যই, কয়েকদিন পর দেবীচরণ ভামিনীর কানে ঝুমকো এবং হাতে রুলি পরাইয়া দিল। ভামিনীর দেহে জীবন-সঞ্চারের জন্য সে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। সে সর্ব্বাঙ্গ তাহার সোনায় মুড়িয়া দিবে। সে উপায় পাইয়াছে, পথ চিনিয়াছে।

ভামিনীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল মণির বাড়ি। দেবী একটু তৃপ্তির হাসি হাসিল। সে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, এমনই ছুটিতে ছুটিতে ভামিনী আসিয়া তাহার পায়ে ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিবে। এই শিষ্টাচারগুলি ভামিনীর বড় ভাল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের মেয়ে, ধর্ম্মে শিষ্টাচারে নিষ্ঠা যে স্বাভাবিক।

কিন্তু ভামিনী ফিরিয়া আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন আবার সেই পূর্ব্বের ভামিনী। প্রণামও সে করিল, কিন্তু দেবীচরণ সে প্রণামে ক্রুদ্ধ না হইয়া পারিল না। সে পা দুইটা সরাইয়া বলিল, থাক।

ভামিনী ভীত দৃষ্টিতে দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবী বলিল, তোমার ব্যাপার কি বল দেখি?

ভামিনী নিরুত্তর; কিসে যেন তাহার মুখের রক্ত তীব্র আকর্ষণে শোষণ করিয়া লইতেছে। দেবীর বুকেও ক্রোধ ক্ষোভ দুর্জ্জয় আক্রোশে পশুর মত

ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, সে ভামিনীর ভাবান্তর গ্রাহ্যও করিল না, তাহার হাতখানা ধরিয়া নির্দয়ভাবে একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, বল বল।

সে নির্দ্দয় আকস্মিক আকর্ষণে ভামিনী প্রতিমার মতই উঠানে সশব্দে পড়িয়া গেল। দেবী আবার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, কিন্তু দেহখানা অস্বাভাবিক ভারী হইয়া উঠিয়াছে। দেবী হাত ছাড়িয়া দিয়া ভামিনীর দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, হ্যাঁ, ফিটই হইয়াছে! ছুটিয়া জলের ঘটি আনিয়া সে ভামিনীর মুখে চোখে জলের ছিটা দিল। কিন্তু একি, চেতনা হয় না যে! এবার সে তাড়াতাড়ি তাহার ওষুধের ঘরে ঢুকিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল—অ্যামোনিয়া। কই? কোথায়? কোথায় যে কি থাকে! সে ছুটিয়া উপরে গেল, সেখানে তাহার একটা আলমারি আছে। হায় রে জীবনের অভিশাপ! ভামিনী পাথর হইয়া যায়, পুতুল হইয়া যায়। কই অ্যামোনিয়া?

—বউদি! ও বউদি!

কে—কে ডাকে? কাহাকে ডাকে?

—আপনার নাকি গয়না হ'ল নতুন? একবার বেরিয়ে আসুন দেখি। আজ একখানা খুব ভাল গান শোনাব আপনাকে।

মুখুজ্জেদের সেই গায়ক ছেলেটা। আলাপ হইয়া গিয়াছে, গোপন আলাপ! স্ত্রীয়াং চরিত্র—স্ত্রীয়াং চরিত্র—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যঃ! আর্সেনিক, আর্গট, কার্বলিক, কোথায় অ্যামোনিয়া?

'এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আনলে বল কে?' ছেলেটা গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! স্ত্রীয়াং চরিত্র—স্ত্রীয়াং চরিত্র!

ওটা তো সেকরাদের বরাতী—রাখিয়া দিতে গিয়া বোতলটা সে টানিয়া বাহির করিল।

মেজার গ্লাসে তরল মৃত্যু—সাইনাইড। হউক, শাপমোচন হউক, উভয়ের জীবনের অভিশাপ! কলঙ্কিনীর মৃত্যুতে—

—মণিদি, মণিদি, এ বাড়ির বউদির বোধ হয় ফিট হয়েছে। প'ড়ে রয়েছেন উঠোনে।—গান বন্ধ করিয়া ছেলেটা এবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

দেবীর হাতে ফিটের ওষুধ! ও কে? দেবী চমকিয়া উঠিল। সে নিজে? এত বর্ব্বর ভয়াবহ রূপ তাহার! দেওয়ালে ঝুলানো আয়না খানার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। উঃ, তাহারই ভয় করিতেছে! অভিশাপের রূপ এত ভয়ঙ্কর। না না, অপরাধ নাই অপরাধ নাই। কন্যা কাময়তে রূপম্। সে বর নয়, সে অভিশাপ।

ভামিনীর জীবন নয়—অভিশাপের ভয়ঙ্কর রূপের অবসান হউক। মেজার গ্লাসে অভিশাপের ঔষধ। মেজার গ্লাসে সে চুমুক দিল।

বাড়িখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে! পুলিস আসিয়াছে, সুরতহাল রিপোর্ট লেখা হইতেছে। দাওয়ার এক কোণে মণি বসিয়া আছে ভামিনীকে লইয়া। ভামিনীর মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, চোখে অর্থহীন দৃষ্টি।

প্রেয়সী

১

রামচন্দ্রপুরের উত্তর পাড়ার বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির মেজকর্তা বৈঠকখানায় একা বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। অকস্মাৎ কি যেন তাঁহার খেয়াল হইল—পট্ করিয়া একগাছা গোঁফ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন—বেটা—তুমি দুধের সর খাবে! বলিয়া আবার একগাছা। আবার একগাছা—আবার একগাছা। এইবার কিন্তু তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইল, গোঁফ জোড়াটির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—উঃ! তারপর একটু চিন্তা করিয়া আপনাকে বোধ করি প্রশ্ন করিলেন—মাথায় টাক পড়ে—গোঁফে টাক পড়ে না কেন? এমন সময় দরজার গোড়ায় খুট্ খুট্ শব্দ উঠিল। দীর্ঘ শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ দরজার মুখেই ভারী একজোড়া চটীজুতা খুলিয়া, প্রকাণ্ড একটা হুঁকা হাতে ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটির চোখে অতিরিক্ত রকমের পুরু কাঁচের একজোড়া চশমা। চশমার ডাঁটি দুইটি আবার নাই—তাহার স্থলে দুই প্রান্ত দড়ির বেড় দিয়া মাথার পিছনে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিদের মত ঘাড় তুলিয়া সমস্ত ঘরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। বোধ করি মেজ কর্তাকে ঠাওর করিয়া লইয়া—হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিয়া কহিল—পেনাম! তামাক খান। সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে মেজকর্ত্তার সম্মুখে হুঁকাটি বাড়াইয়া ধরিল। হুঁকাটায় গোটা-দুই টান দিয়া মেজকর্ত্তা বলিলেন—আচ্ছা—এ—কি করা যায় বল দেখি, রায়?

রায় উত্তর দিল—আজ্ঞে, বাজারের খরচ দেন।

রায় এ বাড়ির বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। পায়ে এক জোড়া ছেঁড়া চটি—চোখে চশমা-পরা রায় এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত। মেজকর্ত্তা বলিলেন—হুঁ—তা দেখে-শুনে নিয়ে এস। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে

রায় অভ্যাস-মত ধীরে ধীরে বলিল—গাছের দব্যি লয় যে পেড়ে আনব, মাঠে পড়ে নাই যে কুড়িয়ে আনব—দোকানে দাম লিবে যে!

উপরের ঠোঁটটা ফুলাইয়া নিম্নদৃষ্টিতে গোঁফগুলি দেখিতেই মেজকর্তা ভোর হইয়া রহিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। রায় বলিল—আজ্ঞে খরচ দেন।

মেজকর্তা চটিয়া উঠিলেন—হুঁকাটা সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—খরচ—কিসের হে বাপু?

রায় কিন্তু দমিল না—সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল—আজ্ঞে, বাজারের।

অপ্রসন্ন মুখে কর্তা বলিলেন—কত?

রায়ও জবাব দিল—সে তো আদ্যিকাল থেকে হিসেব করাই আছে আট আনা। ন-আনা ছিল আট আনা করেছেন—সেই তাই দেন।

মেজকর্তা ট্যাঁক হইতে খুলিয়া ছয় আনা পয়সা রায়ের হাতে দিয়া বলিলেন—অ্যা—এই নাও।

পয়সা কয় আনা চশমার কাছে ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া রায় বলিল—তা কি ক'রে হয়—হিসেবের আঁক তো কমাবার লয়—ই—ছ-আনাতে কি ক'রে হবে?

মেজকর্তা বলিলেন—ওতেই হবে হে বাপু, দেখে-শুনে করতে পারলে ওতেই হবে।

পয়সা ছয় আনা রায় তক্তাপোষে নামাইয়া দিল; কহিল—তা হ'লে আমি পারব না আজ্ঞে, যে পারবে তাকেই পাঠান আপনি। আমি বৌমাকে গিয়ে ব'লে খালাস।

সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরিল। মেজকর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন—বলি শোন হে শোন—এই নাও। বলিয়া একবার কোঁচার খুঁট হইতে একটি আনি বাহির করিলেন। রায়কে বলিলেন—ছেলে নাই—পিলে নাই—এত খরচ কেন হে বাপু? এই সাত আনাতেই সেরে এস যাও। আর জ্বালিও না আমাকে।

রায় তবুও পয়সা লইল না ; সে আরম্ভ করিল—আমারই হয়েছে এক মরণ মেজবাবু—কি ক'রে কি করি আমি! আপনি খরচ দেবেন না—ওদিকে জিনিস কম হ'লে বৌমা আমার ওপরই রাগবে। কোন্ জিনিস কম করব আপনি বলেন দেখি ?

মেজকর্ত্তা বলিলেন—তুমি বড় বকো, রায়জা এই নাও। এবার কোঁচার আর এক খুঁট হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া তাহার তিনটি রায়ের হাতে দিয়া বলিলেন—আর আমার নাই—আর আমি দিতে পারব না। বলিয়া রায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন।

রায় আর প্রতিবাদ করিল না ; পৌনে আট আনা লইয়াই আবার একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে রায়ের চটিজুতার মন্থর শব্দ মিলাইয়া যাইতেই মেজকর্ত্তা উদ্বৃত্ত পয়সাটা মুঠোর মধ্যে অতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ পয়সটা আমি কাউকে দোব না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ির ভিতরে চলিলেন এই তাম্রখণ্ডটি তাঁহার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারের মধ্যে রাখিবার জন্য। এই তাঁহার স্বভাব। আর বার বৎসর ধরিয়া তিনি মধু-মক্ষিকার মত শুধু সঞ্চয়ের মোহে ডুবিয়া আছেন। নৈমিত্তিক খরচ হইতে তাহার এক কণাও সঞ্চয় করা চাই—সে সঞ্চয় তিনি আর খরচ করেন না। এবং এই তিল-সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার একটি পৃথক ভাণ্ডার আছে—তিল জমিয়া জমিয়া আজ পাহাড় না হইলেও স্তূপ হইয়াছে—লোকে বলে বাঁড়ুজ্জেদের আঁটকুড়ো কর্ত্তার ছাতাধরা টাকা। মধ্যে মধ্যে এ কথা মেজকর্ত্তার কানে আসে—তিনি স্তব্ধ হইয়া থাকেন!

বৈঠকখানার পরই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে খামারবাড়ি, অপর অংশটায় দেবালয় ও নাটমন্দির, তাহার পরই সে আমলের পাকা বাড়ি। নাটমন্দির পার হইয়া মেজকর্ত্তা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়িটা এখন তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর দিকের অংশটা মধ্যম তরফের ভাগে পড়িয়াছে। দোতালার শয়ন-ঘরে খাটের শিয়রে সিন্দুকের মাঙ্গলিক চিহ্ন শোভিত লোহার

সিন্ধুক। সিন্ধুকটা খুলিয়াই মেজকর্ত্তা চটের একটা প্রকাণ্ড থলিয়ার মধ্যে পয়সাটি রাখিয়া দিলেন। এক দিকে কাঠের দুইটা হাতবাক্স রহিয়াছে—তাহার একটায় মহলের আমদানীর টাকা থাকে, অপরটায় থাকে বন্ধকী কারবারের সোনারূপার অলঙ্কার পত্র। সম্পদসম্ভারগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। একবার তিনি চটের থলিয়াটা তুলিয়া ধরিয়া ওজন অনুমানের চেষ্টা করিলেন। থলিয়াটার ওজনের গুরুত্বে খুশী হইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন পঁচিশ সের কি ত্রিশ সের, কোন্ ওজনটা ঠিক! কিন্তু বাধা পড়িল, পিছন হইতে মেজগিন্নী বলিলেন—ও হচ্ছে কি?

তাঁহার কোলে একটি শীর্ণকায় শিশু।

থলিয়াটা রাখিয়া দিয়া মেজকর্ত্তা তাড়াতাড়ি সিন্ধুকের ডালাটা বন্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মেজগিন্নী হাসিয়া বলিলেন—ভয় নেই, টাকাকড়ি চাইতে আসি নি আমি—তুমি ধীরে সুস্থে সিন্ধুক বন্ধ কর।

মেজকর্ত্তা অপ্রস্তুতের মত কহিলেন—তা,—তা নাও না কেন তুমি—ইয়েকে ব'লে কি চাই, নাও না কেন!

—না, টাকা তোমার আমি চাই না। তুমি অনুমতি দাও এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নিই। বড় সুন্দর ছেলে গো দেখ একবার।

মেজকর্ত্তা স্থিরদৃষ্টিতে মেজগিন্নির মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন, শিশুর-দিকে চাহিলেন না বা কোনও উত্তর দিলেন না। মেজগিন্নী বলিলেন—ছেলের জন্য তোমার মনের কষ্ট আমি জানি। আমাকে লুকুলে কি হবে—আমার তো চোখ আছে, কি মানুষ কি হয়ে গেলে! কতবার বললাম আবার তুমি বিয়ে কর—সেও করলে না।

মেজকর্ত্তার চিত্ত বোধ করি অস্থির হইয়া উঠিতেছিল—তাঁহার অঙ্গভঙ্গীর চাঞ্চল্যে সে অস্থিরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি কি বলিতে গেলেন, কিন্তু বাধা দিয়া মেজগিন্নি বলিলেন—স্থির হয়ে ব'স দেখি—আমার কাছেও তুমি পাগল সেজে থাকবে?

সমস্ত শরীরটা দুই হাতে চুলকাইতে চুলকাইতে মেজকর্তা বলিলেন—যে গরম—শরীর গুড়গুড় করছে—উঃ

বিছানার উপর হইতে পাখা তুলিয়া লইয়া মেজগিন্নী বলিলেন—ব'স, আমি বাতাস করি।

বার দুই শুষ্ক কাশি কাশিয়া মেজকর্তা বলিলেন—উহু, গরুগুলো কি করছে—মানে খেতে টেতে পেলে কি না—ছাড়, পথ ছাড়।

দরজার মুখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া মেজগিন্নী বলিলেন—আমার কথা শেষ হোক, তবে যাবে। শোন, এই ছেলেটিকে আমি পুষ্যি নোব। চাটুজ্জেদের ভাগ্নে—মা নেই, বাপ নেই; কেউ নেই। মামীও বিদেয় করতে পারলে বাঁচে—সামান্য কিছু দিলেই দিতে চায়।

অস্থির চঞ্চল ভাবে মেজকর্তা বলিয়া উঠিলেন—না না না; ও হবে না, ও হবে না, ও সব কলুষে চারায় কাজ নেই আমার। কি বংশ, না কি বংশ—! ছাড় ছাড় পথ ছাড়।

মেজগিন্নী দৃঢ়ভাবে বলিলেন—না।

মেজকর্তা তখনও বলিতেছিলেন—চোর, না ছ্যাঁচড়, না ভিখিরী ঘরের ছেলে—ও সব হবে না। মরে যাবে—মরে যাবে—চেহারা দেখছ না!

মেজগিন্নীর চোখে জল দেখা দিল, সজল চক্ষে তিনি বলিলেন—ওগো, দু'বেলা ভাত মুড়ি পেট ভরে খেতে পায় না, দুধ তো দূরের কথা। ওদের বাড়ীতে থাকলেই ছেলেটা মরে যাবে।

অকারণে খাটের চাদরখানা টানিতে টানিতে মেজকর্তা বলিলেন—যায় যাক্—মরে গেলে ফেলে দেবে ওরা।

মেজগিন্নী বলিলেন—ছি—অবোধ শিশু তোমার কি দোষ করলে বল তো?

মেজকর্তা আপন মনেই বলিতেছিলেন—পরের ছেলে—পরের ছেলে—হবে না—হবে না। ফিরিয়ে দাও—চার আনা পয়সা বরং—।

মেজগিন্নী ততক্ষণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। সম্মুখের লম্বা বারান্দাটার দূরতম প্রান্তে ক্ষীণ পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে সিঁড়ির বুকের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল। মুখের কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া মেজকর্ত্তা এতক্ষণ স্তব্ধভাবেই দাঁড়াইয়াছিলেন। স্ত্রীর অস্তিত্বের সমস্তটুকু মিলাইয়া যাইতে এতক্ষণে তিনি স্ত্রীর গমন পথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা—আমার ছেলে নেই তো তোমার কি বাপু? তারপর আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—যুধিষ্ঠির নির্ব্বংশ—ভীম নির্ব্বংশ—রাবণ নির্ব্বংশ—কেষ্টঠাকুর নির্ব্বংশ—আমিও নির্ব্বংশ—বংশ নেই তো নেই—হবে কি? বলিতে বলিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। চাষ-বাড়ির প্রান্তে প্রাচীরের গায়ে সারি সারি পেয়ারার গাছ। মেজকর্ত্তা লক্ষ্য করিলেন, বিনা বাতাসেই গাছগুলি আন্দোলিত হইতেছে—বুঝিলেন গাছে বাঁদর লাগিয়াছে; তিনি হাঁকিলেন—নিতাই—ও—নিতাই, পেয়ারা গাছে বাঁদর লেগেছে—তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে। সঙ্গে সঙ্গে গাছ হইতে ঝুপ ঝাপ করিয়া দশ-বারোটি ছেলে লাফ দিয়া মাটিতে পড়িল। মেজকর্ত্তা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ছেলেরা উপদ্রব করিলে তিনি জলিয়া যান। আজও তিনি ঠিক বালকের মত ছুটিয়া ছেলের দলকে তাড়া দিলেন। কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না, বাড়ির বহিঃসীমা হইতে শিশুকণ্ঠের কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বিফলতার জন্য মেজকর্ত্তার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। বিপুল আক্রোশে কয়টা ঢেলা কুড়াইয়া লইয়া তিনি পেয়ারা-গাছের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার মনেই বলিলেন, পেয়ারারই বুনেদ মারব আজ। কিন্তু নিরস্ত হইতে হইল, পিছনের পোয়াল-গাদার আড়াল হইতে কে কাঁদিয়া উঠিল। ফিরিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দুইটি পোয়াল-গাদার মধ্যবর্ত্তী গলির মত স্থানটির মধ্যে বৎসর চারেকের একটি সুন্দর শিশু ভয়ে কাঁদিতেছে। মেজকর্ত্তাকে দেখিয়া বর্দ্ধিততর ভয়ে তাহার কান্না বন্ধ হইয়া গেল। মেজকর্ত্তা ছেলেটির দিকে চাহিয়াছিলেন—অতি সুন্দর

ছেলেটি! অকস্মাৎ তিনি একান্ত লুব্ধ আগ্রহে যেন ছোঁ মারিয়া শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বার-বার চুমা খাইয়া পরমাদরে কহিলেন—ভয় কি, তোমার ভয় কি? পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু চকিত হইয়া উঠিলেন, চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া ছেলেটিকে একরূপ ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে যেন পলাইয়া আসিলেন। বৈঠকখানায় কেহ ছিল না, নির্জ্জন ঘরে আধ আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁপাইতে ছিলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক রূপে প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। হুঁকার মাথার কল্কেটা হইতে তখনও ক্ষীণ রেখায় আঁকিয়া-বাঁকিয়া ধোঁয়া উঠিতেছিল। মেজকর্ত্তা ধীরে ধীরে হুঁকাটাকে তুলিয়া লইয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন। হুঁকাটা তিনি টানিলেন না, নীরবে নত দৃষ্টিতে শুধু হুঁকাটা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। বাহিরে জুতার শব্দ হইল, কিন্তু সে শব্দ তাঁহার কানে গেল না। যে আসিল সে বড়কর্ত্তার পুত্র—মেজকর্ত্তার ভ্রাতুষ্পুত্র মণি। মণি ডাকিল—কাকা!

মেজকর্ত্তা অদ্ভুত দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—আসুন আসুন আসুন। ভাল ছিলেন? নেন, তামাক খান। বলিয়া হুঁকাটা মণির দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন। মণি অপ্রস্তুত হইয়া কয় পদ পিছাইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল—আমি মণি। একটা কথা।
কথা তাহার আর শেষ হইল না, মেজকর্ত্তা হুঁকাটা সেইখানেই নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বৈঠকখানা ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। মণি বিরক্ত হইয়া বলিল সাধে লোকে বলে, ক্ষ্যাপা গণেশ!

২

বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন মেজকর্ত্তার নবীন বয়স, বাঁড়ুজ্জেদের তিন তরফ তখন একান্নবর্ত্তী ছিল। সে আমলে মেজকর্ত্তা কিন্তু এমন ছিলেন না, লোকে তখন তাঁহার নাম দিয়াছিল—বাবু গণেশ। তখন নিত্য সন্ধ্যায় মেজকর্ত্তার আড্ডায় গান-বাজনার মজলিস বসিত। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত

সেতারি আলি নেওয়াজ খাঁ নিয়মিত মাসে একবার করিয়া মেজকর্ত্তার ওখানে আসিতেন। মেজকর্ত্তা খাঁ-সাহেবের নিকট সেতার শিখিতেন। আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্ত্তায়, আদব—কায়দায় মেজকর্ত্তা উঁচুদরের লোক ছিলেন। খরচ-খরচায় তিনি তখন মুক্তহস্ত। বন্ধু বান্ধব লইয়া প্রীতিভোজনের বিরাম ছিল না। বড় ভাই দেখিতেন জমিদারি, ছোট ভাই দেখিতেন মামলা-মোকর্দ্দমা, মেজকর্ত্তার উপরে ছিল জোতজমা, পুকুর বাগান তদারকের ভার।

গ্রামের প্রান্তে চাষ-বাড়িতে মেজকর্ত্তার মজলিস বসিত। নিস্তব্ধ রাত্রে বিপুল হাস্যধ্বনিতে সুষুপ্ত গ্রামবাসী চকিত হইয়া উঠিয়া বসিত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিত—বুঝিতে পারিত মেজকর্ত্তা হাসিতেছেন।

এমনি করিয়া দশ-বারো বৎসর কাটিয়া গেল, তখন মেজকর্ত্তার বয়স ত্রিশ, মেজগিন্নী পঁচিশ অতিক্রম করিয়াছেন। সেদিন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া মেজকর্ত্তা ছোট ভাই কাত্তিকের মেজ খোকাকে কোলে লইয়া জল খাইতে-ছিলেন। বাড়ির পাঁচটি ছেলের মধ্যে এই শিশুটিই নিঃসন্তান মেজকর্ত্তার বড় প্রিয়। নিজে খাইতে খাইতে খোকার মুখে একটু করিয়া তুলিয়া দিতে-ছিলেন।

মেজগিন্নী সেদিন বিনা ভূমিকায় বলিলেন—দেখ, আমি বদ্যিনাথ যাব। তোমাকেও যেতে হবে।

মেজকর্ত্তা ভাইপোকে লইয়া মাতিয়াছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—কেন ?

—ধন্না দোব বাবার কাছে।

মেজকর্ত্তা এবার যেন সজাগ হইয়া উঠিলেন। মেজগিন্নীর কণ্ঠবিলম্বিত মাদুলী ও কবচগুলির দিকে চাহিয়া বলিলেন—অনেক তো করলে, আর কেন ?

মেজগিন্নীর চোখে জল দেখা দিল, কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, বলিলেন—তুমি এই কথা বলছ !

মেজকর্ত্তা খোলা জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজগিন্নী আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন—বাবাকে ধ'রে একবার দেখব। কত লোকের তো বংশ হচ্ছে বাবার কৃপায়।

মেজকর্ত্তা নীরবেই বসিয়া রহিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। মেজগিন্নীও নীরবে উত্তর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহারলুব্ধ খোকা জেঠা-মহাশয়ের দাড়ীতে টান দিয়া কহিল—হাম্। খোকার হাতটা সরাইয়া তিনি বিরক্তিভরে বলিলেন—আঃ। উত্তর না পাইয়া মেজগিন্নী আবার বলিলেন—তুমি না পাঠাও আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও সেখান থেকে আমি যাব। ওদিকে কোলের মধ্যে খোকার চাঞ্চল্যের শেষ ছিল না, জেঠার নাকে এবার সে একটা ছোবল মারিয়া বলিল—দে—হাম। বিরক্ত হইয়া মেজকর্ত্তা খোকাকে মেজগিন্নীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—দিয়ে এসো ওকে, ওর মা'র কাছে। মেজগিন্নী খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া উত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর মেজকর্ত্তা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—খোকাকে তুমি নাও নি কেন ?

মেজগিন্নী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—না। এক গাছের বাকল অন্য গাছে কখনও জোড়া লাগে না।

মেজকর্ত্তা বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন—চল, তাই চল।

* * * * *

মেজগিন্নীর দেওঘর-যাত্রার উদ্যোগ হইতেছিল। যাত্রার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বদিন দ্বিপ্রহরে প্রতিবেশিনীরা অনেকে আসিয়াছিল, ছোটগিন্নী বড়গিন্নীও ছিলেন। এক জন বলিল—বাবার দয়ার শেষ নাই, ওখানে গেলে বাবার দয়া হবেই।

অন্য একজন বলিল—কপাল ভাই কপাল; কপালে না থাকলে বাবার হাত নাই। এই আমার—

সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বাধা দিয়া ক্ষেমা-ঠাকরুণ বলিয়া উঠিল উ,—ব'ল

না মা; বাবার অসাধ্যি কিছু নাই। কার নিয়ে যে কাকে দেন, বাবার ছলা কি কেউ বুঝতে পারে? ওই যে মুখুজ্জে-বাবুদের মণি-বৌ, ওর যে ওই দশটা ছেলে ম'রে তিনকড়ি; ও কে জান?

এক মুহূর্ত্তে মজলিসটা জমিয়া উঠিল। ক্ষেমা-ঠাকরুণ বাবাকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করিল—ও-পাড়ার মুকী দিদি—মোক্ষদা ঠাকরুণ গো, ওই ওরই ভাইপো ম'রে মণি-বৌর ওই তিনকড়ি। জান তো মুকী-ঠাকরুণ মণি-বৌর বাড়িতেই থাকত—খাওয়া পরা সব ছিল মণি-বৌর বাড়িতে—দুজনে গলাগলি ভাব। দশটা ছেলে যখন ম'ল মুকী-ঠাকরুণ বদ্যিনাথ গেল মণি-বৌর হয়ে ছেলের জন্যে ধন্না দিতে। তিন দিনের দিন স্বপ্ন হ'ল—উঠে যা তুই, ওর ছেলে নাই, হবে না। মুকী সে না-ছোড়বান্দা; বলে—না বাবা, দিতেই হবে, না দিলে আমি উঠব না। দ্বিতীয় দিনেও ঐ স্বপ্ন! মুকী উঠল না; বলে—মরব বাবা এইখানে। তখন তিন দিনের দিন স্বপ্ন হ'ল—এই দেখ ভাই, আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছে।

সত্যই ক্ষেমা-ঠাকরুণের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রোত্রীরা সকলে স্তব্ধ-নির্ব্বাক। ক্ষেমা-ঠাকরুণ আবার আরম্ভ করিল—তিন দিনের দিন স্বপ্ন হ'ল—ওর নাই—তবে কেউ যদি ওকে আপনার দিয়ে দেয় তবে হবে। তুই দিবি? মুকী বলিল—হ্যা বাবা দোব। বাবা বললেন—বেশ তবে ওর ছেলে হবে। মুকীর তো আর ছেলে-পিলে ছিল না, ছিল একমাত্র ভাইপো, মুকী তাকে মানুষ করেছিল। পনর-ষোল বছরের সুস্থ সবল ছেলে, ছেলের ছাতি কি! সেই ছেলে ভাই, তারই আট দিনের দিন ধড়ফড়িয়ে ম'রে গেল। তখন মুকী বুক চাপড়ে বলে—হায় আমি করলাম কি গো, এ আমি কল্লাম কি? সেই ছেলে ম'রে সেই বছরই মণি-বৌর এই তিনকড়ি হ'ল।

সকলে স্তব্ধ অভিভূত হইয়া বসিয়া ছিলেন। সহসা বড়গিন্নী বলিয়া উঠিলেন—কি হ'ল রে মেজ, এমন করছিস কেন?

কম্পিত হস্তে মেঝে চাপিয়া ধরিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—দোক্তা খেয়ে মাথা ঘুরছে।

রাত্রে তিনি স্বামীকে বলিলেন—দেখ, কপালে যদি থাকে তবে এমনি বংশ হবে। বদ্যিনাথ থাক।

মেজকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন—আবার কি হ'ল ?

মেজগিন্নী সে কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিলেন না—সকরুণ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। মেজকর্ত্তা আদর করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—ছি—এমন দোমনা হওয়া ভাল নয়।

* * * *

বাবা বৈদ্যনাথ যে কি স্বপ্নাদেশ দিলেন, সে কথা মেজকর্ত্তা এবং মেজগিন্নী জানেন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট সে কথা তাঁহারা প্রকাশ করিলেন না। প্রত্যাবর্ত্তনের কয়দিন পরে মেজকর্ত্তা বড় ভাইকে গিয়া বলিলেন—আমার একটি কথা ছিল দাদা। বড়কর্ত্তা কি একটা দলিল পড়িতেছিলেন, দলিলখানা রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—কি বলবে বল।

একটু ইতস্তত করিয়া মেজকর্ত্তা বলিলেন—আমি মনে করছি পোষ্যপুত্র নোব।

বড়কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—বাবার দয়া হ'ল না ?

মেজকর্ত্তা বলিলেন—সে কথা থাক। এখন আমার ইচ্ছে মেজবৌরও ইচ্ছে যে কাত্তিকের মেজ খোকাকে—

বড়কর্ত্তা বলিলেন—সে কথা কাত্তিককে বল—ছোট-বৌমারও মত চাই—তাঁকেও বলা দরকার।

মেজকর্ত্তা বলিলেন—সে আমি তোমারই ওপর ভার দিচ্ছি।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—বেশ আমি বলছি কাত্তিককে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার বড়বাবু বলিলেন—এ তোমার সাধু সঙ্কল্প গণেশ—ঘরের সম্পত্তি ঘরে থাকবে—একই বংশ—খুব ভাল কথা।

মেজকর্ত্তা হাসি-মুখে চাষ-বাড়ি চলিয়া গেলেন। সেখানে সেদিন পোষ্যপুত্র গ্রহণোপলক্ষে যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণভোজন উৎসব-আয়োজনের ফর্দ্দও হইয়া গেল। গোল বাধিল উৎসবের ফর্দ্দের সময়। বন্ধুদের এক দল বলিল—যাত্রা-গান হোক—কলকাতার যাত্রা। আর এক দল বলিল—তার চেয়ে ভেড়ার গোয়ালে আগুন ধরিয়ে দাও। করাতে হ'লে খেমটা-নাচ করাতে হবে।

মেজকর্ত্তা বলিলেন—কুচ পরোয়া নেই—ও দুই-ই হবে। আর একদিন হোক বৈঠকী মজলিস। খাঁ সাহেবকে লেখা হোক, উনিই সব ওস্তাদ যন্ত্রী নিয়ে আসবেন।

দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া বাড়ির ফটকে ঢুকিয়াই মেজকর্ত্তা দেখিলেন, কার্ত্তিক মেজ খোকাকে কোলে লইয়া বৈঠকখানা হইতে বাড়ির ভিতরে চলিয়াছে। বুঝিলেন কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গিয়াছে। সানন্দে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে ডাকিলেন—বাপু ধন!

কথার সাড়ায় ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক রুষ্ট স্বরে বলিল—না। তার পর মেজ ভাইয়ের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—এত বড় চণ্ডাল হিংসুটে তুমি—তা আমি জানতাম না।

মেজকর্ত্তা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কোন উত্তর না পাইয়া কার্ত্তিক আবার বলিল—এই শিশুকে বধ ক'রে তুমি বংশ রাখতে চাও!—ছি—ছি!

চারিদিক যেন দুলিয়া উঠিল, মেজকর্ত্তা আর্ত্তস্বরে বলিলেন—কার্ত্তিক!

কার্ত্তিকও তখন ক্রোধে জ্ঞানশূন্য; সে বলিল—তুমি লুকালে কি হবে—সত্যি কথা কখনও ঢাকা থাকে না, বুঝেছ! আমরা বাবার স্বপ্নের কথা শুনেছি। চণ্ডাল—তুমি চণ্ডাল!

মেজকর্ত্তা অকস্মাৎ মাটিতে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাটির বুক আঁকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ভূমিকম্প! পরমুহূর্ত্তে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অজ্ঞান।

*　　　*　　　*

সেই দ্বিপ্রহরে গিয়া মেজকর্ত্তা আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন বাহির হইলেন পূর্ণ দুই মাস পরে। সেদিন বরাবর তিনি বড়কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিলেন—আমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিতে হবে।

বড়কর্ত্তা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—ব'স।

ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে করিতে মেজকর্ত্তা এক স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝু কিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে কি দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন—বাপ রে—বাপ রে—বেটা পিঁপড়ের বংশবৃদ্ধি দেখ দেখি ; উঃ, সবারই মুখে একটা করে ডিম! বলিতে বলিতেই তিনি দুই হাত দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীকে দলিয়া পিষিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। বড়কর্ত্তা উঠিয়া আসিয়াছিলেন, মেজ ভাইয়ের পিঠে হাত দিয়া তিনি ডাকিলেন—গণেশ! একান্ত লজ্জিত ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেজকর্ত্তা ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া গেলেন। বড়কর্ত্তা কবিরাজ আনাইলেন, কিন্তু মেজকর্ত্তা ফিরাইয়া দিলেন। ঘর হইতেই বলিয়া পাঠাইলেন—বিষয় ভাগ ক'রে দেওয়া হোক আমার, এর ওর ছেলের পালের দুধের দাম দেবার আমার কথা নয়।

তারপর বিছানার উপরে সজোরে একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—মারি বেটা বদ্যিনাথের মাথায় রাবণের মত এক কিল—থাক বেটা মাটিতে ব'সে। কচু—কচু—দেবতা না কচু!

কিছু দিনের মধ্যেই সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল। সে আজ বারো বৎসরের কথা। তার পর হইতে মেজকর্ত্তা এমনি ধারায় চলিয়াছেন। আরও একটি পরিবর্ত্তন তাঁহার আসিয়াছিল। জপে তপে ধর্ম্মে কর্ম্মে তাঁহার গভীর অনুরাগ দেখা দিল। দারুণ শীতে গভীর রাত্রে যখন লোকে লেপের মধ্যেও শীতে কাঁপিতেছে, তখন মেজকর্ত্তা খালি গায়ে হাত দুইটি বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজিয়া গ্রামপ্রান্তের দেবীমন্দির হইতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে

বলিতে অ-পথ ধরিয়া বাড়ি ফেরেন। যে পথে সাধারণে চলে, সে পথ ধরিয়া তিনি চলেন না—পথচিহ্নহীন নির্জ্জন প্রান্তরে মেজকর্ত্তার পদচিহ্ন নিত্য নব পথরেখার প্রথম চিহ্ন আঁকিয়া দেয়।

৩

ঐ ঘটনার পর হইতে আজও পর্য্যন্ত কখনও আর মেজকর্ত্তা পোষ্যপুত্র লওয়ার নাম করেন নাই, কি সন্তান কামনার কথা মুখে আনেন নাই। অর্থ ও পরমার্থের মোহের মধ্যে বংশকামনা ডুবাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মেজগিন্নী ভুলিতে পারেন নাই—তিনি স্বামীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, পোষ্যপুত্র লওয়ার কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। মেজকর্ত্তার মাথার গোলমাল বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সময়েই তাঁহার অর্থসঞ্চয়ের পিপাসা বাড়িয়া যাইত—আপন শয়নকক্ষে ঐ সিন্ধুকটির পাশেই তখন তিনি অবিরাম ঘুরিতেন—বার বার সেটা খুলিয়া দেখিতেন। কখনও কখনও ধর্ম্মে কর্ম্মে অনুরাগ বাড়িত—কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া পড়িতেন। দেখিয়া শুনিয়া মেজগিন্নী নিরস্ত হইয়াছিলেন—বহুদিন আর ও কথা তোলেন নাই। আজ চার মাসের পর সহসা চাটুজ্জেদের ভাগিনেয় ওই অনাথ শিশুটিকে দেখিয়া কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, স্বামীর নিকট অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছিলেন। ছেলেটির মামী নীচে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—ছেলেটিকে দিয়া কিছু অর্থ প্রত্যাশা তাহাদের ছিল। মেজগিন্নী নীচে আসিয়া নীরবে ছেলেটিকে তাহার কোলে তুলিয়া দিলেন।

চাটুজ্জে-বৌ প্রশ্ন করিল—কি হ'ল ?

মেজগিন্নী সে কথায় উত্তর দিতে পারিলেন না, বুকের ভিতর কান্না মুহুর্মুহু ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। চাটুজ্জে-বৌ বিস্মিত হইয়া আবার প্রশ্ন করিল—হ'ল না ?

ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে মেজগিন্নী জানাইলেন—না। আর তিনি সেখানে দাঁড়াইলেন না, পিছন ফিরিয়া একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধ রায় ঠুক ঠুক করিয়া আসিয়া চশমা দিয়া চারিদিক দেখিয়া মেজগিন্নীকে ঠাহর করিয়া লইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—বৌমা!

মেজগিন্নী শুইয়াছিলেন—উঠিয়া বসিলেন। মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া ক্লান্ত মৃদুস্বরে বলিলেন—চল যাই। বাবু এসেছেন?

ঘাড় নাড়িয়া রায় বলিল—মা, ক্ষেপার মন—বিন্দাবন, কি বলব বল! এগারটার ট্রেনে বলে আমি গঙ্গাচানে চললাম। আমি ওই ওই করতে করতে আর নাই—চ'লে গিয়েছে।

মেজগিন্নী বলিলেন—তা হ'লে তোমরা খেয়ে নাও গে, ঠাকুরকে রান্নাবান্না সামলে দিতে বল।

রায় বলিল—তুমি এস মা, দুটো মুখে দেবে চল।

সস্নেহ হাসি হাসিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—আমি খাব না বাবা, আমার মাথাটা বড় ধরেছে!

রায় আর একটি প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিল। চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া কিন্তু আবার খুলিয়া ফেলিল; বলিল—না গো বৌমা, ই তোমাদের ভাল লয় বাপু। ই—আমার ভাল লাগছে না। দুটো খাও বাপু তুমি। ক্ষেপার সঙ্গে তুমি সুদ্ধ ক্ষেপলে কি চলে!

ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে মেজগিন্নী আদেশ করিলেন—যা বললাম তাই কর গে রায়জী।

রায় আর কথা কহিল না, চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া ঠুক ঠুক করিতে করিতে চলিয়া গেল।

* * *

বহুকাল পর মেজকর্ত্তা আজ কেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অস্থির চাঞ্চল্যে মণিকে পর্যন্ত চিনিতে পারেন নাই—হুঁকা বাড়াইয়া দিতে

গিয়াছিলেন। সেটুকু খেয়াল হইতেই লজ্জায় পলাইয়া আসিয়া আপন শয়ন-ঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। অবিরাম ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে তিনি বলিয়া উঠিতেছিলেন—দুর দুর! একবার ছোট তরফের বাড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—খট খট—লবডঙ্কা।

পরমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন—দূর দূর।

আবার কয়বার পদচারণা করিয়া তিনি বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেও ভাল লাগিল না। বিছানা হইতে উঠিয়া আবার তিনি অস্থির পদে ঘরের মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে চট করিয়া আনলা হইতে কাপড় ও গামছা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—ধুয়ে ফেলে আসি। ধুয়ে ফেলে আসি। শতেক যোজনে থাকি, যদি গঙ্গা বলে ডাকি। বাহিরের হাত-বাক্স হইতে খরচ বাহির করিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ির ফটকের মুখেই রায়ের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল—বৃদ্ধ রায় কি একটা হাতে লইয়া ফিরিতেছিল। পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে মেজকর্ত্তা বলিলেন—গঙ্গাস্নানে চললাম—গঙ্গাস্নানে চললাম—ব'লে দিও—ব'লে দিও!

রায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল—দাঁড়ান দাঁড়ান!

কেহ কোন উত্তর দিল না, রায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মেজকর্ত্তা! বলি শুনচেন গো! অই অ—মেজকর্ত্তা! সে আহ্বানেরও উত্তর কেহ দিল না, রায় ঘাড় তুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া দেখিল, যতদুর তাহার দৃষ্টি চলে কেহ কোথাও নাই।

ষ্টেশনে নামিয়া মেজকর্ত্তা একেবারে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উঠলেন। ঘাটে স্নানার্থী-স্নানার্থিনীর আসা যাওয়ার বিরাম নাই, ঘাটের উপরেই ছোট

বাজারটিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় জমিয়া আছে। মেজকর্তা ঘাটের এক পাশে বসিয়া ওপারে ধূ-ধূ করা বালুচরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রৌদ্রচ্ছটায় বালুচর ঝিকমিক করিতেছে। বহু দূরে চরের উপর সবুজের রেশ! ঘাটে নানা কলরবের মধ্য হইতে নানা কথা তাঁহার কানে আসিতেছিল। অতি নিকটেই কাহারা আলোচনা করিতেছিল—আশ্চর্য্য সাধু ভাই! যে যাচ্ছে তারই নাম ধরে ডাকছে—কোথা আমাদের বাড়ি বল দেখি—ঠিক ব'লে দিল!

আর একজন অতি মৃদুস্বরে বলিল—শ্মশানে ঘাটোয়াল বলছিল কি জান—বলেছিল বাবা মড়া খায়।

মেজকর্ত্তা আগ্রহভরে প্রশ্ন করিলেন—কোথা হে কোথা?

একজন উত্তর দিল—সাধু কি লোকালয়ে থাকে হে বাপু, সাধু যে সে থাকবে শ্মশানে।

মেজকর্ত্তা উঠিয়া পড়িলেন। গঙ্গার তটভূমির উপর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ এক ফালি পথ চলিয়া গিয়াছে—সেই পথটা ধরিয়া শ্মশানে টিনের চালাটায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনতিদূরে গঙ্গাগর্ভের নিকট বালুচরের উপর বেশ একটি জনতা মধুচক্রে মধু-মক্ষিকার মত জমিয়া আছে। তিনি বুঝিলেন সন্ন্যাসী ওইখানেই অবস্থান করিতেছেন। তিনিও অগ্রসর হইয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলেন। জনতার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটা ধুনির সম্মুখে ভীমকায় উগ্রদর্শন এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। নানা জনকে তিনি নানা কথা বলিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে অপরিচিত জনতার মধ্য হইতে এক এক জনের নাম ধরিয়া ডাকিতে ছিলেন। থাকিতে থাকিতে এক সময় মেজকর্ত্তার দৃষ্টির সহিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এস বাবা গণেশ বাঁড়ুজ্জে, রামচন্দ্রপুরের বাঁড়ুজ্জে বাড়ির মেজকর্ত্তা এস। মেজকর্ত্তা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তে বিপুল ভয়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী যদি অন্তরের আরও

কোন কথা এই জনতার সমক্ষে বলিয়া দেয়! তিনি ত্বরিত পদে সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আবার গঙ্গার ঘাটের উপর বসিলেন। কতক্ষণ বসিয়া ছিলেন, তাঁহার নিজেরই ঠিক ছিল না। অবশেষে তাঁহার চমক ভাঙিল কাহার কথায়। ঘাটের উপরের বাজারের এক জন পরিচিত দোকানদার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল—ওই—মেজকর্ত্তা যে! প্রণাম, ভাল আছেন?

মেজকর্ত্তা একটু অর্থহীন হাসি হাসিয়া কহিলেন—ভাল তো?

দোকানী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাদের আশীর্ব্বাদে। তারপর চান-টান করুন। পাকশাকের যোগাড় ক'রে দি—সেবা করবেন চলুন। বেলা যে আর নাই।

মেজকর্ত্তা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই বেলা আর বেশী নাই—সূর্য্যমণ্ডলে ক্লান্তির রক্তাভা দেখা দিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—তাই ত—তা ইয়ে—মানে ফেরবার ট্রেনটা—।

হাসিয়া দোকানী বলিল—সে তো সেই কাল সকাল ন'টায়। তিনটের গাড়ী তো অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

মেজকর্ত্তা ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত ভাবে ঘাটের ধাপে ধাপে গঙ্গার জলে গিয়া নামিলেন।

* * * *

গভীর রাত্রি। দোকানের বারান্দায় মেজকর্ত্তা জাগ্রতচক্ষে শুইয়াছিলেন। ঘুম আসে নাই। বার-বার তিনি উঠিয়া বসিতেছিলেন—আবার শুইতে-ছিলেন। এবার তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিস্তব্ধ পল্লী—শুধু গঙ্গাতটের বনভূমিতে ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত চীৎকার ধ্বনিত হইতেছে। মেজকর্ত্তা শ্মশানের দিকে চলিলেন। বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া প্রবলবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। শ্মশানের বুকে নামিয়া দেখিলেন, জনশূন্য শ্মশানে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে সন্ন্যাসী গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। অল্পদূরে দাঁড়াইয়া করজোড়ে মেজকর্ত্তা ডাকিলেন—বাবা!

সন্ন্যাসী মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন—এস—ব'স। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া মেজকর্ত্তা উপবেশন করিলেন। নর-কপালের পাত্রে কি একটা পানীয় পান করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—কামনা নিয়ে এসেছ বাবা ?

মেজকর্ত্তার কণ্ঠ যেন নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—স্বর তাঁহার বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—কি কামনা বল বাবা ?

বহুকষ্টে মেজকর্ত্তা এবার উত্তর দিলেন—বাবা অন্তর্য্যামী—

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—কিন্তু তোমার কামনার কথা তোমাকেই যে মুখ ফুটে চাইতে হবে বাবা। না চাইলে কি এ সংসারে পাওয়া যায়—তুমি দাও ?

সেই অঙ্গারলিপ্ত তটভূমির উপরেই লুটাইয়া পড়িয়া মেজকর্ত্তা বলিলেন—সন্তান—বংশ ! বাবা বৈদ্যনাথ আমাকে নিরাশ করেছেন, তুমি দয়া কর বাবা।

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, মেজকর্ত্তাও উঠিলেন না, সেই ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় সন্ন্যাসীর পদমূলে পড়িয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ পর সন্ন্যাসী বলিলেন—ওঠ, উঠে ব'স। বলিয়া ঝুলি হইতে একটা মাটির পাত্র বাহির করিয়া খানিকটা পানীয় তাহাতে দিয়া বলিলেন—মায়ের প্রসাদ পান কর। মেজকর্ত্তা শাক্ত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান, বিনা দ্বিধায় তিনি সেটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী নিজেও পানীয় পান করিয়া বলিলেন—শিববাক্য লঙ্ঘন করা যায় না। যায় ?

মেজকর্ত্তা হতাশভাবে বলিলেন—না বাবা, যায় না।

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—যায়। পারে—এক জন পারে। কে জানিস ?

মেজকর্ত্তা বলিলেন—না বাবা।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, বাবার কথা রদ্ করতে পারে—মা রে, বেটা মা, আমার কালীমা—যে শিবের বুকে চ'ড়ে নাচে।

আবার সেই খিল খিল হাসি।

সে হাসির তীক্ষ্ণতায় বনভূমির অন্ধকারও যেন শিহরিয়া উঠিল, উপরে টিনের চালায় সে হাসির প্রতিধ্বনি অট্টহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া তখনও বাজিতেছিল।

মেজকর্ত্তার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী আবার একপাত্র পানীয় মেজকর্ত্তার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। নিজেও পান করিয়া বলিলেন—মাকে আমার তুষ্ট করতে পারবি?

করজোড়ে মেজকর্ত্তা বলিলেন—কি করতে হবে বাবা?

মেজকর্ত্তার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—বলি দিতে পারবি? তন্ত্রমতে আমি তোর জন্যে মায়ের কাছে পুত্রেষ্টি যাগ করব।

মেজকর্ত্তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—হ্যাঁ বাবা।

সন্ন্যাসী বলিলেন—কিন্তু নরবলি—পারবি, দিতে পারবি?

মেজকর্ত্তা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একপাত্র পানীয় তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ভয় কি? অমাবস্যার অন্ধকার—কেউ জানবে না—মানুষের দৃষ্টি সেদিন ঢাকা থাকে। গভীর রাত্রে—দূর শ্মশানে—কেউ জানবে না। মাথার মধ্যে সুরার নেশা আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—চোখও জ্বলিতেছিল অঙ্গারখণ্ডের মত—

মেজকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—পারব—বাবা—পারব।

৪

পরদিনই মেজকর্ত্তা বাড়ি ফিরিলেন। অকারণে খানিকটা অত্যন্ত কৃত্রিম হাসি হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম।

মেজগিন্নী বলিলেন—বেশ করেছিলে।

বোধ করি এ কথার উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মেজকর্ত্তা আরও খানিকটা হাসিয়া বলিলেন—তাই বলছিলাম।

মেজগিন্নী ঠাকুরকে বলিলেন—সকাল সকাল রান্না কর ঠাকুর, কাল থেকে বাবু খান নাই।

অস্থির ভাবে কয় বার ঘুরিয়া ফিরিয়া মেজকর্তা বলিলেন—সেই ছেলেটা, সেই—

শঙ্কিতভাবে মেজগিন্নী বলিলেন—সে তখনই তারা নিয়ে গিয়েছে।

মেজকর্তা আরও একবার ঘুরিয়া অবশেষে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া বিনা-ভূমিকায় বলিলেন—তাকে রাখলেই হ'ত।

মেজগিন্নী স্বামীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—কাকে?

মেজগিন্নীর দিকে পিছন ফিরিয়া রান্নাঘরের চালের একগোছা খড় টান মারিয়া মেজকর্তা বলিলেন—সেই ছেলেটাকে—সেই—

মেজগিন্নী কোন উত্তর দিলেন না। মেজকর্তা আরও একগাছা খড় টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন—পুষ্যিপুত্তুর নাই হ'ল, খেত-দেত থাকত।

বাধা দিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—চালের খড়গুলো কেন টানছ বল তো? যা বলবে সুস্থ হয়ে ব'সেই বল না বাপু।

মেজকর্তা আর দাঁড়াইলেন না, হন হন করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। বৈঠকখানায় গিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অপরিসীম উদ্বেগে তাঁহার বুকের ভিতরটা যেন পীড়িত হইতেছিল। দরজার গোড়ায় রায়ের চটির মন্থর শব্দ উঠিল। রায় আসিয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—বৌমা একবার ডাকছেন গো!

মেজকর্তা চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—অ্যাঁ?

রায় বলিল—দিনরাত এত ভাববেন না—মেজবাবু। বলছি—বৌমা একবার ডাকছেন আপনাকে।

মেজকর্তা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—আমি চণ্ডীতলা চললাম।

রায় শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—অই অই। ই—করে কি? হায়—বলি শুনছেন গো—অ—

মেজকর্তা তখন চলিয়া গিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিলে, মেজগিন্নী অভ্যাস মত পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিলেন। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—তা হ'লে চাটুজ্জেদের ছেলেটিকে—।

মেজকর্ত্তা বলিলেন—হ্যাঁ খাবে-দাবে থাকবে—মানুষ হবে—তা, থাক না—থাক না! খাবে-দাবে—মানে—।

উঠানে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ীর উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরীটা বসিয়া ছিল, সেটা সহসা আকাশের দিকে মুখ করিয়া তারস্বরে দীর্ঘ চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠাকুর তাহাকে তাড়া দিল—দূর—দূর।

মেজগিন্নী বলিলেন—থাক থাক ঠাকুর—ও বাচ্চার জন্যে কাঁদছে—কাল রাত্রে বাচ্চাটাকে শেয়ালে নিয়ে গিয়েছে। ওই—ওই—ওকি কিছুই যে খেলে না?

তখন মেজকর্ত্তা আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন।

অপরাহ্নে ঘুম হইতে উঠিয়া মেজকর্ত্তা জলের গ্লাসটি লইয়া বাহিরে বারান্দায় আসিতেই দেখিলেন, হাসি-মুখে মেজগিন্নী ছেলেটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন—কতবার এলাম, তোমার ঘুম আর ভাঙে না। ভারী সুবোধ ছেলে বাপু—কান্নার নামটি নাই। একবার নাও না কোলে—।

মেজকর্ত্তার আর মুখ-ধোয়া হইল না; অভ্যাস মত দ্রুতপদে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। মেজগিন্নী একটু ম্লান হাসি হাসিলেন; কিন্তু দুঃখ বা অভিমান তিনি করিলেন না।

রাত্রে মেজকর্ত্তা বলিলেন—ওকে ঝিকে দিও, মানুষ করবে। মেজগিন্নী বলিলেন—তাই দোব।

শয্যায় শুইয়াও মেজকর্ত্তার ঘুম আসিল না—অসম্ভব অবাস্তব কল্পনায় তাঁহার মস্তিষ্ক পীড়িত হইতেছিল। তবুও তিনি নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন, পাছে মেজগিন্নী জানিতে পারেন। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন আগামী অমাবস্যা-রাত্রির কথা। ভীমদর্শন সন্ন্যাসী—সম্মুখে যজ্ঞকুণ্ড—ছেলেটা

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দৃশ্য ভাসিয়া উঠে, মেজগিন্নী খোকার জন্য ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে। অকস্মাৎ মনে হয়, ওই ছেলেটার পরলোকগতা মায়ের কথা—তার আত্মা যদি আসিয়া বলে—দাও দাও, ওগো, আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও! সঙ্গে সঙ্গে তিনি বালিশের মধ্যে সজোরে মুখ গুঁজিয়া দেন। বাহিরে তারস্বরে কুক্কুরীটা কাঁদিতেছিল। তিনি শিহরিয়া উঠেন—উঃ! আবার ধীরে ধীরে মেজকর্ত্তা মনকে দৃঢ় করেন।

প্রভাতে উঠিয়া মেজকর্ত্তা দেখিলেন, মেজগিন্নী কখন উঠিয়া গিয়াছেন—ওদিকের খাট শূন্য। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতেন, সে শয্যা কেহ স্পর্শও করে নাই।

* * * * *

দিন দশেক পর।

সেদিন অমাবস্যা, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা খুব কম। মেজকর্ত্তা অমাবস্যার উপবাস করেন, রায়জী করে নিশিপালন। মেজকর্ত্তা বাড়িতে নাই। আজ কয়দিন হইতেই এক সন্ন্যাসী লইয়া মাতিয়া আছেন। সকালেই বাড়ি হইতে চলিয়া যান, ফেরেন দ্বিপ্রহরে—আবার খাওয়া-দাওয়ার পর বাহির হন—গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসেন, তাও বড় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। মেজকর্ত্তার সন্ন্যাসী-সেবা এমন অসাধারণ কিছু নয়—তন্ত্রমতে জপে তপে সুরাপানও তিনি করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া এখন স্বামীর অনুপস্থিতি মেজগিন্নীরও মন্দ লাগে না—খোকাকে লইয়া স্বেচ্ছামত খেলা খেলিতে বাধা পড়ে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর দোতলার বারান্দায় উজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়া মেজগিন্নী খোকাকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ছড়া গাহিতে-ছিলেন—

"তুমি পথে ব'সে ব'সে কাঁদছিলে
মা-মা ব'লে ডাকছিলে।"

চির অনাদৃত অনাথ শিশু শান্ত মুগ্ধ নেত্রে মেজগিন্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কি মোহ সে মুখে ছিল সে-ই জানে।

মৃদু মন্থর জুতার শব্দ করিয়া রায় আসিয়া দাঁড়াইল, মেজগিন্নী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিলেন। হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া রায় বলিল—পেনাম বৌমা।

মেজগিন্নী বলিলেন—কিছু বলছ রায়জী?

রায়জী ধীরে ধীরে বলিল—ই বেটা সাধু তো ভাল নয় মা, বাবুকে যে পাগল ক'রে দিলে গো! দিন-রাত মদ-মদ আর মদ। আজ আবার ব'লে পাঠিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে—দোর সব যেন খোলা থাকে। তা বলি—বলে যাই বৌমাকে। আর কল্কেটা সেজে রেখে যাই, তখন আবার ধর্ ধরবে না। একটু ইতস্তত করিয়া আবার সে বলিল—তুমি এত লাগাম ঢিল দিও না মা। ছেলে নিয়ে তুমিও যে কেমন হয়ে গেলে—একটুকু শাসন-টাসন ক'রো।

মৃদু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মেজগিন্নী অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। মেজকর্ত্তা অতি সতর্ক নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিরন্ধ্র গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড সুষুপ্ত বাড়িখানা গাঢ়তর অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া আছে। শুধু দুই তিনটা খোলা জানালা দিয়া গৃহমধ্যের আলোক-রশ্মি শূন্যের অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত অসহায় প্রেত-দেহের মত ভাসিয়া রহিয়াছে। অতি সতর্কতা সত্ত্বেও মেজকর্ত্তার পা টলিতেছিল। ধীরে ধীরে তিনি অন্দরের দিকে চলিলেন। মৃদু কাতর স্বরে কে কাঁদিয়া উঠিল। মেজকর্ত্তা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ শুনিয়া বুঝিলেন কুকুরটা এখনও শোক ভুলে নাই। আবার তিনি অগ্রসর হইলেন। আজ শ্মশানে তাঁহার পুত্রেষ্টি যাগ হইতেছে। তিনি বলি-সংগ্রহে আসিয়াছেন। বলির সময় সমাগতপ্রায়। সমস্ত দরজা খোলা রহিয়াছে—সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া

তিনি দোতলায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে ঝিয়ের ঘরে ঢুকিলেন। অন্ধকার ঘর, অতি সতর্কতার সহিত দেশলাই জ্বালিয়া দেখিলেন, বুড়ি ঝি অকাতরে ঘুমাইতেছে, কিন্তু শিশু তো সেখানে নাই। বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন—কোথায় তবে? বিদ্যুৎ-রেখার মত একটা কথা মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল। আবার তিনি অগ্রসর হইলেন। এ পাশের আলোকিত বারান্দার দ্বারপথে দাঁড়াইয়া মেজকর্ত্তা দেখিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য—মেজগিন্নীর কোলের কাছে শিশুটি শুইয়া আছে।

ধীরে ধীরে তিনি শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন মেজগিন্নীর বক্ষদেশ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত, মুক্ত। তাঁহার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শিশুটি দুই হাতে মেজগিন্নীকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি স্তন মুখে পুরিয়া অগাধ নিশ্চিন্ত ঘুমে মগ্ন। মাঝে মাঝে স্বপ্নঘোরে মৃদু হাস্যরেখা তাহার অধরে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। মেজগিন্নীর মুখে অতি তৃপ্তির হাস্যরেখা যেন তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। মেজকর্ত্তার সুরাপ্রভাবিত মস্তিষ্কের মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হইয়া যাইতেছিল। হাত-পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তবুও তিনি প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া শিশুকে তুলিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ির বাহিরে প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়া গতি আরও দ্রুত করিবার চেষ্টা করিলেন।

অকস্মাৎ অমাবস্যার অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া কে কাঁদিয়া উঠিল! মেজবৌ! মেজকর্ত্তা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। আবার সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার! বিশ্বের বেদনা যেন সে চীৎকারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। মেজকর্ত্তার বুকের ভিতর যেন ঝড় বহিয়া গেল, তবু আর একবার চেষ্টা তিনি করিলেন। কিন্তু সম্মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াই তিনি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। শ্বেতবর্ণ অশরীরী মূর্ত্তির মত কে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সেটা একটা ছোট তাল-গাছের শুক্‌না পাতা—শিথিল দীর্ঘ বৃন্ত সমেত সেটা ঝুলিতেছিল—অপর কিছু

নয়। কিন্তু মেজকর্ত্তার মনে হইল, এই শিশুর অশরীরী মাতা যেন দীন ভাবে সন্তান ভিক্ষা চাহিতেছে। ওদিকে পিছনে বাড়ির মধ্য হইতে আবার সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার! সে চীৎকারে তাঁহার মর্ম্মস্থল সমবেদনায় অধীর হইয়া উঠিল—সমস্ত বাসনা এক মুহূর্ত্তে তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি ফিরিলেন—উন্মত্তের মত ফিরিলেন—যাই—যাই—মেজবৌ!

ঠিক এই সময়ে দূরে চৌকীদার হাঁক দিতেছিল—ও—ওই! মেজকর্ত্তার মনে হইল, এ রুদ্রকণ্ঠে রুষ্ট তান্ত্রিকের আহ্বান। তিনি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—মেজবৌ! মেজবৌ!

মেজবৌয়ের নিশ্চিন্ত অঞ্চলতলে আশ্রয়ের জন্য প্রাণপণে ছুটিয়া বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মেজকর্ত্তার কণ্ঠস্বর পাইয়া কুক্কুরী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুক্রন্দনে আপনার বেদনা নিবেদন করিল।

মেজকর্ত্তা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—তোর তো আমি নিই নি মা—তোর ছেলে আমি নিই নি।

সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার

চৈত্র মাসের প্রথম। বসন্ত পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমশ উগ্র হইয়া উঠিতেছে—প্রকৃতি ধীরে ধীরে রুক্ষরূপ ধারণ করিতেছে। মাঠের চৈতালী ফসলে রসসঞ্চার শেষ হইয়া ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—অনেকের ফসল ঘরে আসিয়া উঠিতেছে। বৎসরের শেষ, আখেরী কিস্তীর খাজনা আদায়ের সময়। প্রাচীন সরকার বংশের সাড়ে সাতগণ্ডার অংশীদার বনবিহারী সরকার খাজনা আদায়ে চলিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ় যথাসম্ভব দ্রুতগমনে চলিয়াছেন। মাথায় ছাতা সত্ত্বেও তাঁহার গৌর বর্ণ রৌদ্রের উত্তাপে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে তাঁহার বাড়ীর একমাত্র ভৃত্য নিম্নজাতীয় একটি বালক—নাম নন্দলাল। নন্দলাল তাঁহার সব—গরু বাছুরের সেবাও করে, বাজারও করে—আবার চাপরাশীও সাজে। বয়সের অনুপাতে নন্দলাল দৈর্ঘ্যে অনেকটা খাটো—হাত-পা নাড়িলে পুতুলের মত দেখায়, গায়ের রং গাঢ় কালো—সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে সাদা তাহার গোল গোল দুইটি চোখ ও দুই পাটী দাঁত। নন্দলালের বগলে সরকার মহাশয়ের আদায়ের কাগজপত্রের দপ্তর—আঙুলে ঝোলানো দড়িতে বাঁধা দোয়াত ও কলম—অন্য হাতে প্রকাণ্ড এক লাঠি।

বনবিহারীবাবু নন্দলালকে বুঝাইতেছিলেন—বুঝলি নোদা, মহালে গিয়ে যেন ম্যাদারাম হয়ে থাকবি নে। খুব হাঁক ডাক চালাবি—হটবি না কিছুতে। বুঝলি কিনা—মাটী তোর বাপের নয়—মাটী হ'ল গিয়ে দাপের।

নন্দলাল ছোট মানুষটি হইলেও হাত পা ছুড়িতে দীর্ঘাকার মানুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষিপ্র। সে লাঠিসুদ্ধই হাতখানা নাড়িয়া বলিল—দেন কেনে একখানা পাগুড়ী কিনে—ইয়া লাল টকটকে রঙের! দেখবেন আমি কি কাজ করি।

—পেনাম সরকার কত্তা! আদায়ে চলেছেন নাকি?

বিপরীত দিক হইতে দুইজন লোক আসিতেছিল—মুখোমুখী হইতেই একজন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া ঈষৎ নত হইয়া নমস্কার করিল। অপরজন একটু মুচকি হাসিয়া শুধু নমস্কারই করিল। সরকার কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—

আখেরী কিস্তী—আর কি আমাদের অবসর আছে বাবা! হিসেবনিকেশ, কাগজপত্র সারা—অনেক ঝঞ্ঝাট!

তাঁহারা আগাইয়া চলিলেন—লোক দুইটিও বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। একজনের গলা শোনা গেল—সে ব্যঙ্গভরেই বলিল—আমাদের কাগজ-বাবু! ভাগ্যে কাগজের বস্তা চাপা দেয় নাই! দেড় পয়সার জমিদার—কাগজের গল্প শোন কেন!

বনবিহারীবাবু বোধ হয় সে কথা শুনিতে পাইলেন না, কিম্বা হয় তো গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি নন্দলালকে পুরাতন কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—বুঝলি নোদা, এ হ'ল আমাদের আদি পুরুষের কথা। মহাতাপচন্দ্র সরকার বলতেন, মাটি বাপের নয়—মাটি হ'ল দাপের। মহাতাপবাবুর আমলে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেয়েছে। বাপ আমলে—এই তো' তোর পাঁচ পুরুষ আগে—সদরে তোর আট দশটা চাপরাশী—তার ওপর প্রত্যেক মৌজায় একজন করে পাইক, একবার—

নন্দলাল অসহিষ্ণু হইয়া কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল—বড়বাবুদের চাপরাশী এখন অ্যানেক—আর চেহারা কি! পোষাক পরে যখন বেরোয় বাপু, ওঃ! . পাগুড়ী বাঁধা কেলে হাঁড়ীর মত, মুখ দেখলে দাঁত লেগে যায়!

বনবিহারীবাবু পদক্ষেপের গতি খানিকটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—পা চালিয়ে আয়, পা চালিয়ে আয়।

নন্দলাল কিন্তু তখনও বলিতেছিল—পাগুড়ী না হলে বাপু নোকে কেয়ারই করে না। পাগুড়ী বাঁধলে মানুষকে ভড়কালো লাগে। বাবুদের চাপরাশীদের পাগুড়ীর ছামুতে আবার পেতলের একটা কি থাকে—সোনার মত ঝকমক্ করে! ভারী বাহার—

বাধা দিয়া বনবিহারীবাবু বলিলেন—ওরে মুখ্যু—পেতলেরই বা দাম কি—আর খানিকটা লাল শালুরই বা মূল্য কি, ও তোর বিশটা চাপরাশী রাখলেই বা হবে কি? জমিদারীর আসল জিনিষই হ'ল কাগজ—থাক—নকসা—চিঠে

—জমাবন্দী। এসব তোর এক কুটীও ওদের বাড়ীতে আছে? সামান্য একটা বাকী খাজনার মামলায় প্রজা যদি গোলমাল করে একটা জবাব ঠুকে দেয় তা হ'লেই—ব্যস—বুঝলি কিনা!

মাঠের উপর দিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র পরিধি ক্ষীণজীবী ঘূর্ণি কতকগুলা পাতা উড়াইয়া লইয়া পাক দিতে দিতে চলিয়াছিল। নন্দলাল বলিল—এরই মধ্যে ঘুরণ চাক উঠে পড়ল কত্তা—ধরা এবার যা চন্‌চনে হবে বুঝলেন—হ-হ—ঘুরচে দেখ দেখি—হ-হ!

বনবিহারীবাবু আপন মনেই বলিতেছিলেন—এই ধর না কেন—মিয়েদের একটি নানকার জমা আছে—একশো বিঘে জমি—তার দশ টাকা খাজনা। নবাবী আমলের জমা—নবাব মীরকাশেমের আমলের সনদ—ফার্সী হরফে তামার পাতের ওপর লেখা। ওরা সে সনদ বার করে না—অথচ বলে, আমাদের এ হ'ল মোকররা জমা—এ জমার বৃদ্ধি নাই। এখন জমিদাররা কি করবে করুক। করুক জমার বৃদ্ধি দেখি! কিন্তু চল তুই—তোকে দেখাব সে সনদের নকল আমার কাছে আছে। বেবাক মৌজার দোরবস্ত প্রজার কবুলতি—সমস্ত জমার চৌহদ্দী—সমস্ত আমার কাছে।...আরে মিত্তির যে! কি রকম, আদায়পত্র কি রকম হে?

অধুনাতন এ অঞ্চলের প্রধান ধনীর কর্ম্মচারী মিত্তির, সেও আদায়ে চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে সুসজ্জিত দুইজন বরকন্দাজ, দুইজন নিম্নশ্রেণীর পাইক। নন্দলাল মুগ্ধ বিস্ময়ে বরকন্দাজদের প্রতি বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করিতেছিল।

আপন ধনশালী প্রভুর ধনগৌরব ও প্রতিপত্তির মর্য্যাদা বজায় রাখিবার উপযুক্ত সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যের সহিত সহাস্যে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া মিত্তির বলিল—হচ্ছে এক রকম। তবে কি জানেন—আমাদের জোর জবরদস্তি নাই—আকুলি বিকুলিও নাই। যা হ'ল হ'ল, যা না হ'ল সমস্ত নালিশ! তামাদী রক্ষে একেবারে উঠিয়ে দিয়েছেন বাবু। তবে নেহাত যদি কেউ ধরে—তো টাকৃতি সাত আনা সুদ দিতে হবে। তারপর আপনার হালচাল কি রকম?

—হ্যাঁ, তা কিছু কিছু করে সব দেবে বৈকি। আমার ধর গিয়ে তো সুদও নাই—তামাদীও নাই—নালিশও নাই।

বিজ্ঞভাবে মিত্তির বলিল—ওই ক'রেই নিজের সর্ব্বনাশ করেছেন সরকার মশাই। যতই আপনারা ঢাকুন—প্রজাতে ঠিক বুঝতে পারে যে, এ হ'ল জমিদারের এক চাল—নালিশ করবার পয়সা নেই—তাই সুদ রফা দিয়ে তামাদী আদায়ের ফন্দী। কিন্তু তামাদী কি আর লোকে দেয়। যা হোক—যেমন ক'রে হোক—ধার ধোর ক'রেও নালিশ কতকগুলা ক'রে দিন। না হ'লে বিষয় রাখতে পারবেন না।

বনবিহারীবাবু বলিলেন—তার যে উপায় নেই হে—পূর্ব্বপুরুষের নিষেধ—সে লঙ্ঘন করি কি করে?

মিত্তির বলিয়া উঠিল—আর মশায়, তার ফলও তো চোখে দেখছেন। সরকার বংশের জমিদারী তো সবই একরকম বিক্রী হ'য়ে গেল, থাকবার মধ্যে আপনার সাড়ে সাত গণ্ডা—আর মধ্যম কোঁদার ধনদাবাবুদের দশ গণ্ডা,—বাকী সবই তো বিক্রমপুর চ'লে গেল!

বনবিহারীবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন—ভাল কথা মিত্তির,—তোমার মত পাকা লোক এষ্টেটে থাকতে বাবুরা সেরেস্তার কাগজ-পত্র এমন জবর জং ক'রে ফেললে কি ক'রে? সেদিন পান্নু মিশ্রীর কাছে ১১৪৩নং জলকর কমুণ্ডলুর থোকা দেখলাম—রাম রাম, ও কি কাগজ হয়েছে হে! সাবেকী সব ঘর বাদ দিয়ে যা' তা' কতকগুলো নতুন ঘর ঢুকেছে। এই ধর না—যেমন তোমার একটা ঘর হ'ল তলব সুদ। বেশ ভাল কথা—কিন্তু তলব কই হে—সে ঘর আগে কর—তলব আষাঢ়—তলব আশ্বিন—। তা না—তলব সুদ! আদালতে প্রজা আপত্তি দিলে যে কাগজসুদ্ধ বাতিল হয়ে যাবে। থোকা, তোমার সেই সাবেকী আমলের থোকা—একেবারে নিখুঁত। রাজনগরের নবাবদের সেরেস্তার একখানা থোকা আমার কাছে আছে—দাঁড়াও দেখাব তোমাকে। তারপর তোমার আর এক প্রস্থ জমাবন্দীর কাগজ—

সরকারের কথা শেষ হইল না। মিত্তির আপনার প্রভুর কাছারী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল—সে সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ভদ্রতা করিয়া বসিল—আসুন না সরকার মশাই, এইখানেই বসবেন; প্রজারা সব তো এইখানেই হাজির রয়েছে।

সত্যই সমস্ত কাছারীর বারান্দাটা পূর্ব্ব হইতেই সমাগত প্রজায় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারা সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া মিত্তিরকে নমস্কার করিল।

সরকার মহাশয় তখনও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন। নন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল—তাই বসেন গো কত্তা। বাবুদের ডাকে সবাই আসবে—আপনার কাজও হয়ে যাবে। আর তো মোড়লদের ঘরে কেউ আসবে না। ডাকতে গেলে বলবে—আজকে যেতে পারছি না—হয় তো এবারে দিতেই লারব।

সরকার আরও কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে মিত্তিরের প্রভুর কাছারী ঘরেই উঠিয়া পড়িলেন। মিত্তির বলিল—ওরে বেহারী, সরকার মশাইকে ওই দিক দিয়ে একখানা কম্বল পেতে দে তো।

গোষ্ঠ পাল বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা, সে এক থোক টাকা মিত্তিরের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—আমার কাজটা আগে সেরে দেন মিত্তির মশায়। আমাকে একবার কুটুমবাড়ী যেতে হবে।

সরকার ওদিক হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠেই বলিলেন—বলি ওহে গোষ্ঠ, সমস্ত বছরের মধ্যে তো দেখাই করলে না। তা আমার খাজনার কি করছ—তিন বছর বাকী হয়ে গেল তোমার।

গোষ্ঠ মিত্তিরকে বলিতেছিল—আজ্ঞে না—চেকের দামটা এবার মাপ করতেই হবে হুজুর। যোড়হাত করছি আপনাকে—ওই আট আনা পয়সা মাপ এবার করতেই হবে। আর ধরুন ওটা তো বাড়তি আদায় জমিদারের।

সরকার আবার ডাকিলেন—গোষ্ঠ! বলি শুনতে পেলে না, কি হে?

গোষ্ঠর চেকের দাম কিন্তু মাফ হইল না। সে মিস্তিরকে বলিল—তবে আজ্ঞে, চেক রসিদ আপুনি নিকে রাখবেন, কাল এসে নিয়ে যাব। আর এই নেন চেকের দাম আট আনা।

সরকার আবার ডাকিলেন—গোষ্ঠ!

গোষ্ঠ এবার যেন শুনিতে পাইল—সে সরকার মশাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—এবার আর আপনি বলবেন না কত্তা। বছর ভারী খারাপ, আর আপনকার তো তাগাদা নাই।

সরকার ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—দেখ গোষ্ঠ, তোর মত লোক যদি অভাব গায়, তা হ'লে আমাদের চলে কি ক'রে? না বাপু, এবার আমি নালিশ ক'রে দেব।

নন্দলালের তরুণ রক্ত ক্রমশঃ গরম হইয়া উঠিতেছিল—সেও বলিয়া উঠিল—তুমি ব'স, ব'সে খাজনা দিয়ে যাও। উ বাবুদিগে দিলে আর আমাদের বেলায় লারব। গোষ্ঠ অত্যন্ত রূঢ় রকমের একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—কে রে বেটা হারামজাদা ছোটলোক, চুপ ক'রে থাক বলছি।

তারপর সরকারের দিকে ফিরিয়া বলিল—তা' হ'লে তাই নালিশ ক'রেই নেবেন কত্তা, বোলপুরের বড়তলাতেই দোব আমি। তার আগে দোব না। ছোটলোক দিয়ে অপমান করান আপুনি!

সরকার বলিলেন—এই দেখ তোমার মৃত্যুবাণ আমার হাতে গোষ্ঠ! তোমার ওই লাখরাজ পুকুরও হ'ল মাল জমার সামিল। ১২৫৬ সালের মামলার রায়ের নকল আমার কাছে আছে। তুমি বুঝে আমার সঙ্গে—

গোষ্ঠ, মিস্তির ও সরকার মশাইকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল—শেষ পর্য্যন্ত কথা শুনিবার তাহার অবসর হইল না।

সরকার মহাশয় মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তিনি বেশ অনুভব করিতেছিলেন—মিস্তির মৃদু মৃদু হাসিতেছে; বোধ হয় বরকন্দাজ কয়জনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে ভাবটা কাটাইয়া লইয়া তিনি

অপর একজন প্রজাকে বলিলেন মহিন্দি, তুমি কি বলছ গো? তোমার তো এবার চার বছর!

মহেন্দ্র বলল—আপনি তো বছরে সাড়ে পাঁচ আনা ক'রে পান, তা এক বছরের চেক কেটে দেন, পয়সা দিচ্ছি।

—ঋষি, তুমি কি বলছ?

তা, দিতে হবে কৈ। তবে আজ কাল ত হবে না কত্তা; আজ বাবুদিগে দিলাম। তা, দিন চারেক পরে দোব।

ওদিকে মিত্তিরের সেরেস্তায় কাহার একটা কি গোল বাধিয়াছিল। সরকার তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বলিলেন—গোবিন্দ ঘোষের জমা তো? ও নাও না কেন আমার মুখে আছে। আন তো নোদা দপ্তরটা; কাগজ কাকে বলে একবার দেখ।...গোবিন্দ ঘোষের জমা তোমার ১২৮৫ সালে—

মিত্তির খানিকটা স্থান করিয়া দিয়া বলিল—বসুন, বসুন, ব'সে ব'সেই বলুন।

সরকার মহাশয়ের দৃষ্টিতে অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিল, গোষ্ঠ পালের তাচ্ছিল্যের গ্লানি অনেকটা যেন মুছিয়া গিয়াছে।

তিনি চাপিয়া বসিয়া বলিলেন—এ জমার কবুলতি শুদ্ধ আমার কাছে আছে।

মিত্তির বলিল—একবার দিতে পারেন আমাকে?

সরকার বলিল—ওইটা মাফ করতে হবে। যেয়ো তুমি, দেখাব; কিন্তু হাতছাড়া করতে পারব না।

* * * *

২

এমন সময় অর্থাৎ এখন হইতে পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে সরকারবাবুরা এখানে প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠাশালী জমিদার ছিলেন। জমিদারির আয় অধিক ছিল না, মোটমাট হাজার তিনেক টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু জমিদারীর তুলনায় তাঁহারা জমিদার ছিলেন বড়। বিষয়কে বাদ দিয়াও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন সরকারবাবুরা ; তাই বিত্তের তুলনায় প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশী এবং অধিকৃত ভূমির পরিধি অপেক্ষা খ্যাতির পরিধি ছিল বহুগুণে বৃহৎ।

কিন্তু দুই পুরুষ পর হইতেই তাঁহাদের পতন আরম্ভ হয়। বিষয়ে তখনও ঋণ প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বংশেই যেন রোগ প্রকাশ করিল—সরকার বংশে মানুষের অভাব ঘটিল, সরকার বংশের চরিত্রগত মহান অংশটুকু নষ্ট হইয়া গেল। বংশে মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া গেল প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বংশোচিত স্বভাব ও চরিত্রের দৃঢ়তা এবং কর্ম্মক্ষমতার অভাব ঘটিল। মধুমক্ষিকার বংশে যেন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পঙ্গপালের উদ্ভব হইল, তাহারা সরকার বংশের বৈভব ও প্রতিষ্ঠার মধুচক্রটি নিঃশেষে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এখনও সরকার বংশে বংশধরের অভাব নাই, কিন্তু বিষয় বা প্রতিষ্ঠা কিছু তাহাদের নাই। শুধু বনবিহারীবাবুর দেড় পয়সা ও অপর একজনের দশ গণ্ডা পরিমিত অংশ এখনও বজায় আছে।

যাক! বনবিহারীবাবু বাড়ী ফিরিলেন বেলা দুইটায়। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক বনবিহারীবাবু। বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে আছেন তাঁহার ভাগিনেয় রমেন্দ্রের পত্নী। একমাত্র ভাগিনেয়ই তাঁহার উত্তরাধিকারী, ভাগিনেয়টিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষও করিয়াছেন তিনি। ভাগিনেয় রমেন্দ্র কাটোয়ার স্কুলে পঞ্চান্ন টাকা বেতনে চাকরী করে। বাড়ী ফিরিয়াই বধূর নিকট হইতে রমেন্দ্রের পত্র পাইলেন—রমেন্দ্র আজ সন্ধ্যায় বাড়ী আসিবে, দিন কয় ছুটি আছে।

বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন—নোদা!

তারপর তিনি আদায়ের তহবিল মিল করিতে বসিলেন।

নন্দলাল তখন রমেন্দ্রের স্ত্রীকে বলিতেছিল, অদ্যকার ঘটনার কথা, চোখে তার জল আসিয়াছিল—কর্ত্তার যেন্না পিত্তিও নাই বউঠাকরুন! গোষ্ঠা চাষা অপমান ক'রে উঠে চ'লে গেল—লোকে সব হাসতে লাগল। সবাই হাসে ঠাট্টা করে, বলে কাগজ-সরকার। তুমি বাপু, দাদাবাবুকে ব'ল—কর্ত্তা যেন নিজে আদায়ে না যায়।

সরকার মহাশয় তহবিল মিল করিয়া দেখিলেন পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা আদায় হইয়াছে। লাল খেরুয়ার থলিতে সেগুলি তুলিয়া রাখিয়া আবার ডাকিলেন—নোদা, বলি—ওরে, শুনছিস!

নন্দলাল বিরক্ত হইয়াই আসিয়া দাঁড়াইল। বনবিহারীবাবু বলিলেন—যা দেখি একবার বিপনে জেলের বাড়ী। রমন্দ আসবে আজ—বিপিনকে ব'লে আয় আজ সেই বিল জমার দরুণ মাছটা দিতেই হবে।

নন্দলাল মহা বিরক্ত হইয়া বলিল—লারব বাপু আমি, আপনকার পেজার কাছে আমি আর যাব না। দেবে না তো যেয়ে কি করব আমি!

বনবিহারীবাবু বলিলেন—তার ঘাড় দেবে। দেবে না কি রকম? আমি কি ভিক্ষে চাইছি নাকি? চিরকাল পেয়ে আসছি—১২৬৩ সালের বন্দোবস্ত—তার কবুলতি আমার কাছে, দেবে না কি রকম? গুজস্তা জমা সালিয়ানা দরুণ 'সরালদহের' বিল এক মণ চব্বিশ সের, নিজ রকম সাড়ে সাত গণ্ডায় দেড় সের সেস্ দেড় ছটাক, এই তোর পাওনা এক সের সাড়ে ন' ছটাক, দেবে না কি রকম?

নন্দলাল বলিল—লেকা তো আপনকার অ্যানেক রইছে, দেয় কে বলেন তো? বেশ, আমি চললাম, কিন্তুক সে যদি দেয় তো আমার কান দুটো মলে দেবেন তখন।

নন্দলাল চলিয়া গেল। সরকার কাগজের বস্তা লইয়া বসিলেন।

রমেন্দ্রের স্ত্রী আসিয়া বলিল—একি, এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলেন? স্নান করুন, বেলা কি আর আছে? এর পর আপনার আবার আহ্নিক আছে?

একখানা পুরাতন কাগজ বধূর দিকে আগাইয়া দিয়া সরকার বলিলেন—দেখতো মা কাগজখানায় কি লিখছে! দেখ দেখি লিখিতং শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ পিতা ৺রাধাপদ ঘোষ—কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে—।

বধূ বলিল—না, তা তো কই লেখা নাই। এ যেন কোন জমা-খরচের কাগজ বলে মনে হচ্ছে—দুদিকেই সারিবন্দী টাকার অঙ্ক সব—।

দেখি দেখি দেখি! মহা ব্যস্ত হইয়া সরকার হাত বাড়াইয়া বলিলেন—বোধ হয় তোমার নবাববাড়ীর সেহার কাগজ—দেখি দেখি! চশমাটা আবার কোথায় গেল।

বধূ বলিল—না মামা, এখন ওসব রাখুন আপনি, স্নান করুন।

—পেঁয়াজ লেবা গো! পেঁ-য়া-জ! বাহিরে ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া উঠিল। সরকার বলিলেন—বউমা, পেঁয়াজ কিছু কিনে রাখ—রমন্দ আসছে। ওরে ও পেঁয়াজওয়ালা! কত নেবে বউমা?

—এক সের নেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরকার বলিলেন—কম কেনা আমাদের এক স্বভাব! এক সেরে ক'দিন তোমার যাবে বল তো? বেশ বাপু, পয়সা আমি দিচ্ছি, দে রে পাঁচ সের দে। আর টাকাটেকের মুসুরী কলাই আনিয়ে দিই, কি বল? রমন্দও আসছে আর রোজ দুবেলা তোমার কাঁচা কলাইয়ের ডাল ভাল লাগছে না বাপু!

বধূ বলিল—যা আনতে হয় আমি আনাচ্ছি—কই, আদায়ের টাকা কটা আমাকে দেন তো।

বলিয়া সে নিজেই লাল খেরুয়ার থলিটি তুলিয়া লইল।

সরকার শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ তোমার চাকরীর পয়সা নয় মা—

এর আবার পাই—পাই কি কড়া ক্রান্তির হিসেব রাখতে হবে। তুমি সে পারবে না! দাও দাও!

বধূটি হাসিয়া থলি শ্বশুরের হাতে দিয়া বলিল—নেন, কিন্তু এমন ক'রে বেশী খরচ আপনি করতে পারবেন না। আর এখুনি উঠে স্নান করুন।

নন্দলাল কালো মুখ আরও কালো গম্ভীর করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—হ'ল তো কত্তা—, গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি হয়—বুঝলে!

সরকার প্রশ্ন করিলেন—কি হ'ল—দিলে না?

—দেবে! বলে কত কথা শুনিয়ে দিলে। দেড় পয়সা ভাগের জমিদারের তলবেই নাকি প্রাণ গেল তার! মাছ টাছ সে এমন ক'রে দেবে না। বড় বাবুদের কাছারিতে—

সরকারের অঙ্গ যেন জ্বলিয়া গেল—তিনি নন্দলালকেই চীৎকার করিয়া বলিলেন—বড়বাবু কে—বড়বাবু কে রে বেটা? বলি কবুলতি হয়েছে কার সঙ্গে—সরকারবাবুদের সঙ্গে, না বড়বাবুর সঙ্গে, শুনি? নিয়ে যা তুই কবুলতি—দেখিয়ে আয় বেটা জেলেকে—১২৬৩ সালের কবুলতি—

তিনি কাগজের সিন্দুকের সম্মুখে আবার চাপিয়া বসিলেন। বধূ এবার তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—না, এখন আর কাগজ ঘাঁটতে পারবেন না আপনি। আপনি কি আমাকেও খেতে দেবেন না?

সরকার কর্ত্তা অগত্যা উঠিয়া বলিলেন—এই দেখ বউমা, বলছ বটে তুমি কিন্তু এসব হ'ল জমিদারী কাজকর্ম্ম—বুঝলে মা—এ হ'ল আলাদা জিনিষ। তোমরা এ বুঝবে না—প্রজা হ'ল সন্তান তুল্য—কিন্তু অবাধ্য প্রজা—ত্যাজ্য-পুত্রের সামিল। দুষ্ট পুত্র হতে হয় প্রাণ সংশয় আর দুষ্ট প্রজা থেকে হয় রাজ্যনাশ, বুঝলে মা! ও বেটাকে জব্দ না ক'রে আমার আর শান্তি নাই! খেয়ে উঠেই আমি কাগজপত্র বের করছি!

নন্দলাল অন্তরালে ভেঙ্গাইয়া বলিল—কাগজপত্র বের করছি! এদিকে মুরদ নাই এক কড়া—আবার লাফানি দেখ!

সন্ধ্যায় রমেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিল। সরকার কর্তা নিজেই ষ্টেশনে গিয়াছিলেন—জিনিষপত্র বহিয়া আনিবার জন্য নন্দলাল এবং সরকার-বাবুর লাখরাজের নির্দ্দিষ্ট প্রজা একজন সঙ্গে গিয়াছিল। রমেন্দ্রের সঙ্গে কিন্তু সামান্য কয়টা জিনিষ ছিল। সরকার কর্ত্তা রমেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন—আর কই?

রমেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—কি?

—জিনিষপত্র—ফলমূলের ঝুড়ি—বিছানা?

ওই তো ওই ছোট ঝুড়িটায় কিছু ফল আছে।

নিরাশ হইয়া সরকার কর্ত্তা বলিলেন—বেশী কিছু আনতে পারিস নি বুঝি!

পথে আসিতে আসিতে তিনি বলিলেন—আনতে হয় রে—জিনিষপত্র কিছু বেশীই আনতে হয়। আমাদের হ'ল পুরানো বনেদী ঘর—পাঁচজনে দেখে—দুটো আশাও করে। এই সেদিন বড়বাবুর ভাই-পো এল—পাঁচটা লোকে জিনিষ নিয়ে গেল। লোকে অবাক হয়ে দেখলে।

রমেন্দ্র বলিল—ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা মামা? লাখ টাকা ওদের আয়!

সরকার বলিলেন, হ্যাঁ—তা—বটে! তবে আমাদের হ'ল জমিদারের ঘর—মান সম্ভ্রম বজায় তো রাখতে হবে বাবা!

৩

পরদিন সকালবেলা। বনবিহারীবাবু আদায়ে যাইবার জন্য কাগজপত্র গুছাইয়া লইতেছিলেন, রমেন্দ্র আসিয়া একেবারে বিনা ভূমিকায় বলিল—মামা, আদায়ে আপনি আর যেতে পারবেন না।

বনবিহারীবাবু বিস্ময়ে যেন হতবাক হইয়া গেলেন—এমন অসম্ভব বিস্ময়কর কথা তিনি জীবনে কখনও শোনেন নাই। রমেন্দ্র আসিয়া

তাহার স্ত্রীর নিকট ও নন্দলালের নিকট গোষ্ঠ পাল ও বিপিন জেলের কথা শুনিয়াছে—নন্দলাল কাগজ-সরকার নামটি পর্য্যন্ত তাহার কর্ণ গোচর করিয়াছে। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ ভাগিনেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন—সে কি রমন্দ? সামনে লাটবন্দী—চোত মাস আখেরী কিস্তির আদায়, তামাদীর সময়—কাগজপত্রে বাকী বকেয়া নানা গোলমাল—কালেক্টরীর টাকা লাগবে!

বাধা দিয়া রমেন্দ্র বলিল—হোক—কালেক্টারীর টাকা আমি দিচ্ছি। আপনি আর যেতে পাবেন না। সামান্য চাষা-ভুষোয় আপনাকে অপমান করবে—

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বনবিহারীবাবুও নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া রমেন্দ্র আবার বলিল—ও জমিদারি না জমাদারি। ও সম্পত্তিতে কোন দরকার নাই—ও আপনি বিক্রী করে দিন।

প্রবল বিস্ময়ে বনবিহারীবাবু এবার বলিয়া উঠিলেন—বলিস কি রে! জমিদারী সম্পত্তি—পাঁচ পুরুষ আমরা এখানকার জমিদার—আজ বিক্রী করে দিয়ে পরের মাটীতে পা দোব কি ক'রে? তা ছাড়া মান খাতির—দশের পূজো—এ কি ছাড়া যায়!

—কোথায় তোমার মান খাতির—দশের পূজো?—তা হ'লে কি গোষ্ঠা চাষা তোমায় অপ্রমান করে, না বিপনে জেলে তোমার ন্যায্য পাওনা দিতে দশ কথা ব'লে পাঠায়?

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বনবিহারীবাবু বলিলেন—এই কথা! আচ্ছা তবে দেখ—মুখ্যু তো নস—দেখ প'ড়ে দেখ।

বলিয়া দপ্তর খুলিয়া দুইখানা পুরাতন দলিল তাহার হাতে দিয়া বলিল—এই হ'ল গোষ্ঠ চাষার মৃত্যুবাণ। আর এই হ'ল বিপনের। দেখ না তুই, আজই কেমন জরিমানা আদায় হয়ে যায়। আজকের কাগজ নয় ১২৫৬ সাল আর ১২৬৩ সালের।

মামার কথা শুনিয়া রমেন্দ্র হাসিবে না কাঁদিবে বুঝিতে পারিল না। সে মামার পায়ে ধরিয়া বলিল—আপনি বুঝতে পারেন না মামা—এ জন্যে লোকে কত ঠাট্টা ইঙ্গিত করে—লোকে আপনাকে ঠাট্টা ক'রে কাগজ-সরকার বলে ডাকে।

হিংসে ক'রে বলে ও কথা। এ চাকলার সব মিঞার হাঁড়ির খবর যে আমার ঘরে! অংশ সাড়ে সাত গণ্ডা হ'লেও সমস্ত কাগজ যে আমার ঘরে—আমাকে অমান্য করে সাধ্যি কার! 'জমিদারী সম্পত্তি বেচ' কি বলতে আছে—ছিঃ। লাভবান সম্পত্তি একশো টাকার ওপর লাভ জমিদারী স্বত্ব পাকা সোনা!

—বেশ, বিক্রী করতে হবে না পত্তনী দিয়ে দেন।

—আরে, সে তো তোর বিক্রীর সামিল। গবর্ণমেণ্টের ঘরে নাম—প্রজার কাছে সম্মান—চ'লে যাও তুমি আপন এলাকার মধ্যে—দুধারের লোক পেনাম করবে! কিছু মনে ক'র না বাবা, এ জিনিসের মর্ম্ম তুমি বুঝবে না—তোমরা হ'লে উড়োপাখার জাত কুলিনের ছেলে—তোমার বাপ দাদার ছিল পেশা বিবাহ! বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রমেন্দ্র কিন্তু ছাড়িল না, সে বলিল—বেশ তো—জমিদারিই যদি করবেন তবে জমিদারী চালেই করুন—গমস্তা রেখে আদায় করুন। আপনার পূর্ব্বপুরুষ তো কর্ম্মচারী রেখেই আদায় করতেন—নিজে তো দপ্তর বগলে বেরুতেন না!

এবার বনবিহারীবাবু বিব্রত হইয়া পড়িলেন, মাথা চুলকাইয়া শেষে বলিলেন হ্যাঁ, তা বটে! তবে কি জানিস, গমস্তাকে তো মাইনে লাগবে! তা ছাড়া গমস্ত-নামাই চোর। আর এতে তোর প্রজাদের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা শোনা—মান-খাতির—

বাধা দিয়া রমেন্দ্র বলিল—না, তার দরকার নাই; আপনি খান দান আর পূজো অর্চ্চনা করুন—এমনভাবে আপনি আদায় করতে পারবেন না। গমস্তার মাইনে আমি দোব। আর তা যদি না হয়—তবে আমাকে ছেড়ে

দেন—আমি এখানে থাকতে পারব না—যেখানে চাকরি করব, সেখানেই থাকব।

বনবিহারীবাবু এবার আর সম্মতি না দিয়া পারিলেন না। ওই বাবুদের কর্ম্মচারী মিত্তিরকেই আদায়ের ভার দেওয়া স্থির হইয়া গেল। মিত্তিরকেই রমেন্দ্র পত্র লিখিয়া পাঠাইল।

বেলা দ্বিপ্রহর গড়াইয়া যায়। রমেন্দ্র আসিয়া ডাকিল—এখনও ব'সে ব'সে কি করছেন' মামা? স্নান করুন!

একখানা কাগজে বনবিহারীবাবু কি লিখিতেছিলেন—সেখানা রমেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন—আমার কি নিশ্চিন্দি ব'সে থাকবার যো আছে রে বাবা! গমস্তার হাত থেকে হিসেব নিতে হবে, তার চুরি বন্ধ করতে হবে! তা দেখ কেমন কাগজ তৈরী করলাম, দেখ—একটা ক্রান্তি হারালে কি এক কৌটা জমির গোলমাল হ'লে, এক নজরে ধরা প'ড়ে যাবে! মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ীর কাগজের নকল!

অপরাহ্নে মিত্তির আসিয়া কাগজপত্র লইয়া গেল। এটা তাহার উপরি লাভ; সে তাহা ছাড়িবার ব্যক্তি নয় তবে বন্দোবস্ত করিয়া লইল—বনবিহারীবাবুর প্রাপ্য টাকা সে আদায় না হইলেও নিজে হইতে দিবে—কিন্তু সে যাহা করিবে, তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পাইবেন না।

বনবিহারীবাবু আপত্তি তুলিলেন; কিন্তু রমেন্দ্র তাঁহাকে জোর করিয়া রাজী করাইল। সে নিশ্চিন্ত হইল মামার আর কিছু করিবার রহিল না—এ প্রায় পত্তনী বন্দোবস্তের সামিল।

৪

সেদিন অপরাহ্নে রমেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া গ্রামে ঢুকিয়াই দেখিল তাহার মামা একখানা কাগজ হাতে—আগে আগে চলিয়াছেন। রমেন্দ্রের সম্মুখেই পথপার্শ্বে বাঁড়ুজ্যে

বাড়ীর কাছারী—বাঁড়ুজ্জোরা এখানকার সরকার বাড়ীর দৌহিত্র এবং মধ্যবিত্ত জমিদার। তাহাদের কাছারীতে রহস্যালাপের প্রচুর হাস্যধ্বনি উঠিতেছিল।

একজন বলিতেছিল—দেখলে তো মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ীর কাগজের নকল! কাল আবার দেখতে পাবে—দিল্লী সেরেস্তার কাগজের নকল। কাগজ-সরকারের জ্বালায় অস্থির রে বাবা! দেড় পয়সার জমিদারিতে আবার গমস্তা নিযুক্ত হয়ে গেল।

আর একজন বনবিহারীর ভঙ্গী নকল করিয়া বলিল—আর ১২৬৩ সালের দলিলের কথাটা শুনলে? কবুলতি ওর কাছে আছে; কিন্তু দেখাতে নিষেধ আছে বাপু!

সকলে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় দুঃখে রমেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। লজ্জায় যে দুঃখ—সে দুঃখের পশ্চাতে পশ্চাতে মনে আসিয়া জাগে ক্রোধ। দ্রুতপদে স্থানটা অতিক্রম করিয়া কিছু দূরে যাইতেই রমেন্দ্রের মনে ক্রোধ জাগিয়া উঠিল, এবং সে ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার ওই বুদ্ধিহীন মামার উপর। এতটুকু মান-অপমান বোধ কি নাই তাঁহার! আর ওই কাগজ! ওই কাগজ-গুলাকে একদিন পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে সে।

দ্রুতপদেই সে চলিয়াছিল। কিন্তু পথে বাধা পড়িল—বাড়ী যাওয়া আর হইল না। লক্ষ্মী মুখুজ্জে তাহার সমবয়সী বন্ধুলোক—তাহার ওখানে নিয়মিত তাসের আড্ডা বসে। বন্ধুজনে সেইখানে তাহাকে আটক করিল।—আরে—আরে—ঘোমটা মুড়ি দিয়ে হন্ হন্ ক'রে যাও কোথা? বলি বাড়ীতে প্রেয়সী নাই কার—ব'স—ব'স দু হাত খেলে যাও।

প্রেয়সীর জন্য সে ব্যাকুল নয়, এইটুকু প্রমাণ করিবার জন্যই তাহাকে বসিতে হইল। তাসের আড্ডা শেষ করিয়া যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন বনবিহারীবাবু অঘোরে ঘুমাইতেছেন। সুতরাং সেদিন কিছু আর বলা হইল না, কিন্তু মনের

জালা তাহার গেল না। নিদ্রাহীন চক্ষে সে বসিয়া রহিল। স্ত্রীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রমেন্দ্র উঠিয়া মুক্ত অঙ্গনে বসিয়া অন্ধকার রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবী সুপ্ত নিস্তব্ধ—তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিল। উত্তরোত্তর সে উতলা হইয়া উঠিতেছিল—ক্রমশঃ তাহার মনে হইল এমন যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা বুঝি আর নাই; সমস্ত পৃথিবীর সহিত যোগসূত্র যেন কে নির্ম্মম হস্তে কাটিয়া দিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া সে দেখিল, মামা তাহার বহুপূর্ব্বেই উঠিয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর বাহিরে রাস্তার উপর হইতে বনবিহারীবাবুর কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল। রমেন্দ্র বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বনবিহারীবাবু বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর পাচকের সহিত আলাপ করিতেছেন।

—হ্যাঁ—ঘরেই আছি। মানে—আর তো ধর নিজে আদায় করছি না—মহালে সব গমস্তা নিযুক্ত ক'রে দিলাম। রমেন্দ্র ধর একটা বড় চাকরী করছে—তা ছাড়া আমাদের জমিদারের ছেলের কি আর ওসব নিজে করা সাজে!

পাচকটি বলিল বেশ, বেশ! তা বেশ করেছেন। বলিয়া সে পা বাড়াইল, বনবিহারীবাবুও তাহার সঙ্গ ধরিয়া বলিলেন—গমস্তারা অবশ্যি চোর হয়, কিন্তু আমার কাছে সে চালাকি তো খাটবে না! পাঁচ পুরুষ ধ'রে আমরা জমিদার—রক্তে আমাদের হিসেব-জ্ঞান আছে। এমন কাগজ আমি এবার—

আর বনবিহারীবাবুর কথা শোনা গেল না—পাচকটির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাস্তার মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। একটি রাত্রির ব্যবধানে লজ্জা দুঃখ হেতু যে ক্রোধ রমেন্দ্রের মনে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া আসিয়াছিল—সে ক্রোধ এই মুহূর্ত্তে আবার দ্বিগুণিত উত্তাপে প্রখর হইয়া উঠিল। মনে মনে সে সংকল্প দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া বাড়ী ঢুকিল। বেলা আটটা হইতে নয়টা বাজিয়া

গেল তবুও বনবিহারীবাবু ফিরিলেন না। রমেন্দ্র ক্রমশ অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে নন্দলালকে ডাকিয়া বলিল—দেখে আয় তো বাজারে, মামা কোথায় আছেন,—ডাক তো তাঁকে।

নন্দলাল বলিল—যাবে আর কোথা বলেন—বাজারে দাঁড়িয়ে পুরানো কাগজ—'

ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া রমেন্দ্র বলিল—হারামজাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! পুরানো কাগজের মর্ম্ম তুই কি বুঝবি?

নন্দলাল গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পেলাম না।

পেলি নে? রমেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল—পেলি নে কি? ছোট একটা গাঁয়ের মধ্যে মানুষ হারিয়ে গেল।

বিরক্ত ভরে নন্দলাল বলিল—গাঁয়ে থাকলে তো পাব, না কি! বেনেরা বললে কত্তা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

রমেন্দ্র এবার নিজেই বাহির হইল। ঘণ্টা দুই মাঠে ঘুরিয়াও সে মামার সন্ধান পাইল না। অবশেষে ঘর্ম্মাক্ত দেহে, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্ত্রীকে লইয়া অদ্যই মাতুলালয় ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া বাড়ী ফিরিল। বনবিহারীবাবু তখন ফিরিয়াছেন, ঘরের মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত একখানা বই পড়িতেছিলেন।

রমেন্দ্র উচ্চকণ্ঠেই বলিল—মামা!

বনবিহারীবাবু মুখ তুলিয়া অপরাধীর মত হাসিয়া বলিলেন—তুই আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলি?

রমেন্দ্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনের কঠিন কথাগুলি কিন্তু বহির্গমনপথে তাহার মাতুলের লজ্জিত দৃষ্টির সহিত মুখোমুখী হইয়া যেন লজ্জা পাইয়া থামিয়া গেল।

বনবিহারীবাবু বলিলেন—এই মাঠ ঘুরে এলাম একটু—কি করব ব'সে

ব'সে যবে? আর ধর, তাতে লজ্জাই বা কি! নিজের এলাকার মধ্যে—পরের এলাকায় তো পা দিই নি।

তিনি হাতের বইখানা ফেলিয়া দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। একটু ইতস্তত করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—আর একটা কথা বলছিলাম রমন্দ।

কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, নীরব হইলেন। রমেন্দ্র বইখানার দিকে চাহিয়াছিল—সেখানা অতি পুরাতন ছিন্নপ্রায় প্রথমভাগ। অকস্মাৎ রমেন্দ্রের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, প্রদীপ্ত দিবালোক যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এ যেন গভীর অন্ধকার রাত্রি, সমস্ত পৃথিবী সুপ্ত নিস্তব্ধ! তাহারই মধ্যে একা নিদ্রাহীন পৃথিবীর সহিত যোগসূত্রহীন তাহার মামা। মাথার উপরে অসংখ্য কোটী নক্ষত্রখচিত আকাশ—উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির পাশেই অতি ক্ষীণদীপ্তি তারকাটিও টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে, যেন সে নিজেকে স্ফীত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। তাহার মামা ওই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবিরাম—

তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল, মামা বলিলেন—যেন বহু সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—তুই বড় হয়েছিস, আমারও ধর বুড়ো বয়স—খরচ আমি বেশী করব না—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।

কুলীনের মেয়ে

ধনদা মুখুজ্জের কন্যা তরু শেষে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল।- এই মেয়েটিই অতি দুঃস্থ পরিবারটির কর্ণধারহীন সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়া ছিল। পরিবারের মধ্যে বিধবা ভ্রাতৃজায়া, একটি বালক ভাইপো, আর নিতান্ত নাবালিকা একটি ভাইঝি। পাড়াগাঁয়ে যাহাকে বলে—সাপের গর্ত্ত, ইঁদুরের গর্ত্ত হইতে আহার সংগ্রহ করা—তাই করিয়া তরু বাপের বংশটির ভরণপোষণ করিয়া চলিতেছিল। অতি দুঃখেও তাহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকিত; লোকে বলিত, ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি তরু। সেই তরু কেন যে অকস্মাৎ ধৈর্য্য হারাইয়া বসিল, তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিল না। তরুও ঘুণাক্ষরে তাহার কোন আভাস দিয়া গেল না।

রাত্রি এগারটার সময়েই তরুর যন্ত্রণাকাতর ধ্বনিতে তাহার ভ্রাতৃজায়ার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে পাড়া প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনিল।

তরুর মুখ দিয়া তখন ফেনা ভাঙিতেছে—মৃত্যু বুকে আসিয়া নির্ম্মমভাবে চাপিয়া বসিয়াছে। তরুর দেহখানাকে সে যেন দুমড়াইয়া ভাঙিয়া জীবনটুকু টানিয়া বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তরুর সই—প্রতিবেশিনী জমিদার-গিন্নী ডাকিলেন—সই—সই!

অতিকষ্টে চোখ মেলিয়া তরু উত্তর দিল—অ্যাঁ!

স্নেহভরে জমিদার-গিন্নী প্রশ্ন করিলেন—এ কাজ কেন করলে সই? তরু অবশপ্রায় হাতখানি কপালের উপর রাখিয়া বোধ করি ইঙ্গিত করিল—কপাল, অদৃষ্ট!

আচ্ছন্নতা প্রগাঢ় হইয়া আসিতেছিল—জমিদার-গিন্নী তাহাকে নাড়া দিয়া আবার ডাকিলেন—সই—সই! তরু!

তরু চোখ মেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখ খুলিল না—ভ্রূ-দুইটি খানিকটা উপরে উঠিল মাত্র। মুখে সে জড়িতস্বরে বলিয়া উঠিল—ছি—বড় ঘেন্না।

আবার মৃদুস্বরে বলিল—আর সহ্য হ'ল না। আর—

আবার সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ডাক্তার আসিয়াছিল। ইনজেকশন—ষ্টমাক-পাম্প দিয়া বিষের সহিত যুদ্ধও যথেষ্ট চলিতেছিল। কিন্তু বিষ তখন বিষম হইয়া উঠিয়াছে—উপায় ছিল না। ডাক্তার হতাশ হইয়া উঠিতেছিল। সে আর একটা ইন্‌জেক্‌সন দিল। বিষ-ঘোরের আচ্ছন্নতার মধ্যে তরু একটু মুখ বিকৃত করিলমাত্র। জমিদার-গিন্নী আবার তাহাকে সজোরে নাড়া দিয়া ডাকিলেন—তরু—তরু!

ইন্‌জেক্‌শনের শক্তি-ফলেই বোধ করি তরু এবার একবার চোখ মেলিয়া কয়েকটি কথা বলিল—আঃ—আর ডেক না গো!

জমিদার-গিন্নী বলিলেন—আবার দেখবি?

তরু স্থিরদৃষ্টিতে সইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন—তারণকে একবার দেখবি? ডাকব?

তরু বলিল—ছি!

তরু সধবা—তাহার স্বামীও এই গ্রামেরই অধিবাসী—নাম বিপদতারণ। পেশাদার কুলীন বিপদতারণ—সর্ব্বশুদ্ধ তাহার ছয়টি বিবাহ। জমিদার-গিন্নীর চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল ঝড়িয়া পড়িল। দারুণ-যন্ত্রণায় আক্ষেপে তরু আঁকিয়া বাঁকিয়া গোঙাইতে-গোঙাইতে জড়িতস্বরে বলিল—মুক্তি দাও হে ঠাকুর!

মুক্তি সে পাইল ভোররাত্রে—প্রায়-অবসন্ন রাত্রির অন্ধকার তখন শুখ-তারার আলোকে ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে—সে অস্ফুট আলোকে তরু মানুষের অজানা পথে যাত্রা করিল।

কাঁদিবার বড় কেহ ছিল না—ভ্রাতৃজায়া একবার কাঁদিয়া নীরব হইল; কিন্তু ছেলেমানুষ ভাইপোটির কান্নায় নৈশ প্রকৃতির খানিকটা অংশ সকরুণ ভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। ঐটুকুতেই বোধ করি তরুর অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা সার্থক হইয়া উঠিল।

এদিকে কিন্তু বাস্তব সংসারে ইহার পরেও অনেক-কিছু অপেক্ষা করিয়াছিল।

প্রভাত হইতে-না-হইতে পুলিস আসিয়া দরজায় বসিল; সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, ছেলেটা এক মুহূর্ত্তে সভয়ে কান্না থামাইয়া যেন মূক হইয়া গেল।

ভদ্রলোক কয়েকজন আসিয়াছিল। পুলিশের সব-ইনস্পেক্টর তাহাদের সমক্ষে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। তরুর বিছানার মধ্যে দুইখানা পত্র পাওয়া গেল। একখানা শিরোনামাহীন—সেখানায় সে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছে—আমি আপন ইচ্ছায় বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিতেছি। বড় লজ্জা—বড় ঘৃণার জীবন—এ যাওয়াই ভাল। আর সহ্য করিতে পারিলাম না।

অপরখানিতে দক্ষিণপাড়ার জমিদার গাঙ্গুলীবাবুর নাম লেখা ছিল—যোগীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলীবাবুকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দিয়াই পত্রখানি খোলান হইল। পত্রখানি পড়িতে পড়িতে তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল—মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে একটা সদ্যজাত শিশুর ভূমিকা লইয়া তরু প্রবেশ করিয়াছিল! একটি সচ্ছল গৃহস্থ—বাপ, মা, দুই বড় ভাই, তরুর আদরের আর সীমা ছিল না। বাপ ধনদা মুখুজ্জের পৈত্রিক অবস্থাই শুধু সচ্ছল ছিল না—তাঁহার নিজের উপার্জ্জনও ছিল পর্য্যাপ্ত। স্থানীয় রেজেষ্টারী আপিসে কাজ করিতেন—বেতন পনর টাকা—কিন্তু উপরি-পাওনা দৈনিক দুই তিন টাকার কম ছিল না। তাহার উপরে ছিলেন একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির। তাঁহাদের বংশকেই লোকে বলিত—মাথাখারাপের বংশ। ধনদাবাবুর পিতা একদিন প্রয়োজনের সময় একটা সূচ না পাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া পাঁচ টাকার সূচ কিনিয়া সমস্ত বাড়ি ঘরের দেওয়ালে সূচী-কণ্টকিত করিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—সূচের অভাব আমার বাড়ীতে!

আরও একটা খেয়ালের কথা বলি—তিনি ছিলেন কুলীনের ঘরের ভাগিনেয়—মাতুলদের আশ্রয়েই বাস ছিল।—মাতুল ছিলেন সে আমলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। পূজার সময় সপরিবারে দেশে আসিতেন। তখন রেল মোটর ছিল না—পাল্কীই ছিল সম্ভ্রান্ত যান। সেকালে তাঁহার মাতুলের বৃহৎ সংসার

আট-দশখানি পাল্কীতে সদর হইতে যেদিন গ্রামে ফিরিত, সেদিন দশ-খানা পাল্কীর বেহারার হাঁকে গ্রামখানা সরগরম হইয়া উঠিত। ইতর ভদ্র সকলে দলে দলে দেখিতে ছুটিত। ভদ্রলোকেরা সাগ্রহে কুশল জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগে কথা কহিয়া ধন্য হইত। ধনদাবাবুর পিতার সে সহ্য হইত না। বলিতেন—অ্যাঁ—সবাই গিয়ে মামাকেই বলবে—কখন এলেন—কেমন ছিলেন? মুরদ তো একখানা পাল্কীর। লে আও পাল্কী। তিনি নিজে এক পাল্কী চাপিয়া গ্রাম হইতে মাইল-দুই দূরে গিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মাতুল-পরিবারের পাল্কীবাহিনীর সাড়া পাইবা-মাত্র তিনি হুকুম দিতেন—উঠাও পাল্কী। হামারা পাল্কী আগে যায়গা। মাতুলের আগেই তাঁহার পাল্কী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিত, পাল্কী হইতে নামিয়া তিনি প্রতীক্ষমান ভদ্রজনদের সহিত নিজেই আলাপ করিতেন—কি চাটুজ্জে মশায় যে—নমস্কার, নমস্কার। বাড়ির সব ভাল—আপনি ভাল আছেন? আমি ভালই আছি। এই আসছি।

তাঁহার পিতা—ধনদাবাবুর পিতামহ, আহার করিতে বসিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইতেন প্রশ্ন করিতেন—বলি—হ্যাঁ হে আর খেতে পারবে—পেট ভরেছে কি না বল দেখি?

ধনদাবাবুও পিতা-পিতামহেরই মত ছিলেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব তাঁহার ছিল না। কেহ বলিলে বলিতেন—হিসেব কিসের রে—হিসেব? একের পরে শূন্য দিলে হয় দশ—আর এক শূন্য দিলে শ—আবার শূন্য দাও হাজার—ফক্কা দিয়ে অঙ্ক বাড়ানোর নাম হিসেব? তাঁহার তিন পুত্রও বংশের ধারা হইতে বাদ যায় নাই—বড়টি মাতাল, মেজটি বদ্ধ গোঁয়ার, ছোটটি ছিল তানসেন। স্কুলে ফোর্থ ক্লাস হইতে প্রমোশন না পাইয়া যেদিন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল, সেদিন ধনদাবাবু বলিলেন—ঝাঁটা মার ইস্কুলের মুখে—কিছুই জানে না বেটারা। লেখাপড়ার জন্যে কান্না কিসের—কাঁদছিস কেন তুই—একরাতে তোকে বিদ্যেন ক'রে দেব আমি। তাহার

পরদিনই তিনি ছেলেকে তবলা কিনিয়া দিলেন। যাক্, তের বৎসর পর্য্যন্ত তরুর জীবনের ভূমিকায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সংস্থান নাট্যকার করেন নাই। ছোট মেয়েটি আনন্দময়ী প্রতিমার মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত—দাদার মাষ্টারের নিকট নিজে হইতেই গিয়া গভীর মনোযোগের সহিত একখানা ইংরেজী বই খুলিয়া মনে যাহা আসিত তাহাই পড়িয়া যাইত। ছাত্রীটির অনুরাগ দেখিয়া মাষ্টার তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইলেন। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলিতে গিয়া কোন্দল বাধাইয়া ফিরিয়া আসিত—তুই শালপাতা ছেঁটে ছুঁয়ে দিলি কেন আমাকে? বলব না—গাল দেব না আমি? হ্যাঁ ভাই গঙ্গাজল!

সন্ধ্যায় সে মায়ের আঁচল ধরিয়া আব্দার ধরিত—গল্প বল তুমি—বিয়ের গল্প।

এই বিবাহের গল্পের উপর তরুর বিশেষ একটি প্রীতি ছিল। নিত্য সন্ধ্যায় বিবাহের গল্প না শুনিলে তাহার হইত না। তাহার তের বৎসরের সন্ধ্যার মধ্যে শৈশব ও শেষের দুই বৎসর ছাড়িয়া দিয়া এই শোনার ব্যতিক্রম যে কয় দিন ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা বোধ করি হিসাব করিয়া বলা যায়। মা গল্প বলিতেন—এই রস্থনচৌকী বাজাবে—ঢোলের বাজনা হবে। মশালের আলো জ্বালিয়ে হুম্‌হাম্ ক'রে বরের পাল্কী আসবে। রাঙা টুক্‌টুকে বর। ইদিকে লুচি ভাজা হবে, সন্দেশ হবে, মুড়কী হবে, মুড়ী হবে। ঘরের মধ্যে তরুর পাটী-পেড়ে চুল বেঁধে দেব। তরু গয়না পরবে—হাতে দেব কাঁকনি, ওপর হাতে বাজুবন্ধ, গলায় মুড়কী-মাদুলী, কোমরে গোট।

তরু নীরব নিস্তব্ধ—তাহার 'হুঁ' দেওয়া কখন বন্ধ হইয়া গেছে। মা নাড়া দিয়া ডাকেন—তরু, তরু ঘুমুস না—খেয়ে ঘুমুবি। অ—তরু!

তরু জাগিয়া উঠিয়া বলে—তারপরে?

তরুর ছোটদাদা বুক বাজাইয়া তবলার একটা বোল সাধিতে সাধিতে

পান লইতে আসিয়াছিল। সে তরুর মাথার উপরে একটা চাঁটি মারিয়া দিয়া বলিল—কন্তে-ধাগিনাক্—

* * *

তরুর এই 'তার পর' প্রশ্নের উত্তর নাট্যকার তাহার জীবনভূমিকার মধ্যেই রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তের বৎসর বয়সেই সে উত্তর সে পাইল। ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তখন বাংলা দেশে বল্লাল সেনেরই রাজত্ব চলিতেছে। গঙ্গাযাত্রার পথেও কুলীনকে তখন লোকের কন্যাদায় উদ্ধার করিতে হইত। ধনদাবাবু সেদিন তাঁহার পিতার মাতুলপুত্র—স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণবাবুর বৈঠকখানার দরজা হইতেই লাফ দিতে এবং চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন—বাপ রে, বাপ রে, খেলো রে—।

কৃষ্ণবাবু শশব্যস্তে বাহির হইয়া আসিলেন—কি হ'ল, কি হ'ল—ধনদা-ভাইপো?

ধনদাবাবু বলিলেন—প্রকাণ্ড এক সাপ! বাপ রে বাপ, হাতচারেক লম্বা, ইয়া ফনা! খেয়ে ফেলেছিল আর একটু হ'লেই।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—কোথায়?

ধনদাবাবু বলিলেন—তোমার সিঁড়ির মুখেই, বাপ রে বাপ!

আস্তিক—গরুড়—আস্তিকস্য মুনের্মাতা—। সাপের কথা শুনিয়াই কৃষ্ণবাবুর লোকজন লাঠিসোঁটা লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা আগাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবাবুও গেলেন, পিছনে ধনদাবাবু।

সাপ দেখা গেল না। কৃষ্ণবাবু বলিলেন—দেখ সব ভাল ক'রে খুঁজে।

তাঁহার কথা শেষ হইল না, ধনদাবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ঐ—সাপ!

—কই!

ধনদাবাবু কৃষ্ণবাবুর কাপড় টানিতেছিলেন, বলিলেন—পালিয়ে এস—পালিয়ে এস বাবা।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—সাপ কই ?

—ঐ যে, ঐ যে ঘাসের মধ্যে। ঘাস নড়ছে। নড়ন্ত ঘাসের উপরে লাঠিবৃষ্টি হইয়া গেল। তাহার পর তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল হাত-খানেক লম্বা একটি হেলে-সাপ !

কৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন—মধুসূদনের ঝাড়ের দোষ, তোমার দোষ কি বল !

ধনদাবাবুরা মধুসূদন তর্কলঙ্কারের বংশ। ধনদাবাবু বলিলেন—সাপ ত বটে হে বাপু। ওটাই কি কম ? ওর আবার বিষ বেশী, নামই হ'ল হলাহল। ওটা খেলেই যে—বাস, ধনদা-ভাইপো অক্কা। নাও, চা করতে বল।

চা তখন সবে দেশে ঢুকিতেছে। কৃষ্ণবাবুর বৈঠকখানা সে আমলে ছিল সমস্ত গ্রামের চায়ের আসর। সর্দ্দি হইলে কেহ কেহ এক-একটা পাঁচ-সেরি খোরাবাটী হাতে চা লইতে আসিত।

তামাক টানিতে টানিতে ধনদাবাবু হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন—বাপজান, ফেসাদ তো চুকিয়ে ফেললাম।

কৃষ্ণবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন—ফেসাদ আবার কি হ'ল, কই কিছু তো শুনি নাই, তুমিও বল নাই।

ধনদাবাবু বলিয়া উঠিলেন—ফেসাদ নয় ? মহা ফেসাদ। মেয়ের বিয়ে দাও, বিয়ে দাও ! আরে, বিয়ে দাও বললেই হ'ল !

কৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন—ও, তরুর বিয়ের কথা বলছ ?

—দেখ দেখি বাপু, ছেলে হয় মেয়ে হয় খেয়ে খেলে বেড়ায়—সেই তো ভাল। তার আবার বিয়ে কেন রে বাপু !

কৃষ্ণবাবু হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ধনদাবাবু কয়েকবার ঘন ঘন নলে টান দিয়া বলিলেন—তা আমি তো ফেসাদ চুকিয়ে ফেললাম বাপজান। সব ঠিক হয়ে গেল।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—কোথা ?

বার-দুই মাথা নাড়িয়া ধনদাবাবু বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। বাপজান, এ কি তোমাদের চোখ, এ আমাদের শিকেরী চোখ। আমাদের ঘরের দুয়ারেই পাত্র—হরিচরণের ছেলে তারণ—ওই যাকে বলে আঁটী-চোখো তারণ।

*　　　　*　　　　*

কৃষ্ণবাবুর বিস্ময় ধনদাবাবুর গোচরেই আসিল না। তিনি মহা উৎসাহ-ভরে বলিতেছিলেন—কুলীনের সেরা কুলীন—কেশব চক্রবর্তীর সন্তান।

কৃষ্ণবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—কুল তো ভাল, কিন্তু ছেলে যে কুলাঙ্গার।

ধনদাবাবু প্রবল প্রতিবাদ তুলিয়া বলিলেন,—খুব ভাল ছেলে। পাঁচ হিংসুকে বলে মন্দ। অতি উত্তম ছেলে।

কৃষ্ণবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি শুধু ধনদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনদাবাবু থামেন নাই। তিনি বলিলেন, সেদিন একনজরে আমি চিনে নিয়েছি। যে খাতিরটা আমাকে করলে সেদিন—ওঃ, সে আর তোমাকে কি বলব! জলের সময় আসছি—ছাতা নাই—দেখেই আমাকে ডেকে বসালে, নিজের হাতে তামাক সেজে খাওয়ালে। বুঝলে কি না, সেইখানেই ওর মা নিজে সেধে কথা পাড়লে।

কৃষ্ণবাবু এতক্ষণে বলিলেন,—এরই মধ্যে পাঁচটা বিয়ে ওর হয়ে গিয়েছে—তা জান?

ধনদাবাবু উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলেন—বাঃ, কুলানের ছেলে বিয়ে করবে না! আরও দশটা করে নাই এই আশ্চয্যি।

কৃষ্ণবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কাজটা ভাল হবে না ধনদা-ভাইপো, পেশাদার কুলীনের ছেলে—ও কখনও বশ মানে না।

ধনদাবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—রূপোর শেকল দিয়ে বেটাকে বেঁধে রাখব। ঘর ক'রে দেব, জমি দেব, আর সবরেজেষ্টারী আপিসে একটু কাজে ঢুকিয়ে দেব, বুঝলে! বাস আর যাবে কোথা, ঘুরে ঘুরে নড়েই

ব'সে তাঁবেদার হয়ে থাকবে। বজ্জাতি করলেই যাতে-তাতে ফাইন ক'রে দেব।

কৃষ্ণবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার অসন্তুষ্টি অনুমান করিয়া ধনদাবাবু বলিলেন—তারণের মা খোশামোদ করছে। পাত্রপক্ষ খোশামোদ করছে—এ কখনও ছাড়তে আছে? কোথা এখান-ওখান ক'রে লোকের খোশামোদ ক'রে বেড়াই বল তো?

কৃষ্ণবাবু এ কথারও কোন জবাব দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধনদাবাবু আবার বলিলেন—গাঁজা মদ একটু খায়, রংটা কালো, তার আর কি হবে? কুলাঙ্গার বলছ, ও আঙ্গারে আগুন ঠেকালেই আঙ্গার আগুন, বুঝলে। ঘরসংসার হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।—বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া সারা হইলেন। কৃষ্ণবাবু নীরব হইয়াই রহিলেন।

* * *

তরুর জীবন ভূমিকার একটি পট পরিবর্ত্তিত হইল। অদৃষ্ট নাট্যকারকে মানিতে গেলে বলিতে হয়, তাহারই নির্দ্দেশ-অনুযায়ী তরু একদিন রাঙা চেলী পরিল, চোখে কাজল পরিল, আভরণ পরিল, বসনে ভূষণে রাজকন্যা সাজিয়া রাঙা টুকটুকে বরের প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া রহিল।

তারপর শুভক্ষণে বিপদতারণের জীবনের সহিত নিজের জীবনের গ্রন্থি বাঁধিয়া লইল। ধনদাবাবু কন্যার বিবাহে খরচের ত্রুটি করেন নাই। বরাভরণে, দানে তিনি ভার বোঝাই করিয়া দিয়া কন্যাকে জামাতার সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

ফুলশয্যার রাত্রে তরু বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তারণের খোঁজ ছিল না—সে কোথায় গিয়াছে। অস্বাভাবিক হইলেও বরের বাড়িতে এ লইয়া কোন ব্যস্ততা বা আন্দোলন ছিল না। অকস্মাৎ কাহার আস্ফালন-আহ্বানে বহির্দ্বারে উচ্চ আঘাত-শব্দে তরুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাত্রি বোধ

হয় গভীর, বাহিরে কোথাও আর কোন শব্দ নাই। সদ্য ঘুম ভাঙিয়া অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে আপনাকে দেখিয়া তরু ভয় পাইয়া গেল। তারপর তাহার মনে পড়িল, এ স্বামীর ঘর। ওদিকে দরজা-খোলার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাহার কণ্ঠস্বরও সে শুনিতে পাইল,—আজকের দিনেও কি এই কাণ্ড করে? জড়িত উচ্চস্বরে কে বলিয়া উঠিল—কেয়া হায়? কোন্ শালার পরোয়া করি আমি?

কে বলিল—ওরে শোন—শোন।

সেই মুহূর্তেই তরুর শয়নঘরের দরজা প্রচণ্ড আঘাতে আছাড় খাইয়া খুলিয়া গেল; টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল তারণ, তাহার এক হাতে একতাল কি রহিয়াছে।

তারণ আসিয়াই বলিল—ইধার আও—এই, ইধার আও।

সে মূর্ত্তি আস্ফালন দেখিয়া তরু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

তারণ বলিল—তোর মুখের ছাঁচ তুলব আমি এই কাদা দিয়ে—এই কাদা দিয়ে—।

হাতটা নাড়িয়া কাদার তালটা দেখাইতে গিয়া হাত হইতে কাদার তালটা থপ করিয়া পড়িয়া গেল। তরু সভয়ে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তারণ কাদার তালটা মাটি হইতে চাঁচিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল—পরী দেখতে চেয়েছে তোর মুখের ছাঁচ, তোর মুখের ছাঁচ তুলব আমি।

পরী একটা নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক। পরীর কথা তরু জানে, বিবাহের পূর্ব্বেই শুনিয়াছে। তরুর চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল—গলা দিয়া স্বর তাহার বাহির হইল না।

তারণ বলিল—পরীকে বালা দিতে হবে—খুলে দে তোর বালা।

তরু বালা দুইগাছা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। তারণ খুশী হইয়া বলিল—আব ইধার আও, মুখের ছাঁচ লেঙ্গে—আও, আও—

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তারণ অগ্রসর হইল। তরু এবার প্রাণপণে

সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিয়া দরজার দিকে ছুটিল। তারণও ছুটিল, দরজার মুখেই সবলে তরুকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার মুখের উপর কাদার তালটা চাপাইয়া দিল। কাদার তালটা তুলিয়া লইয়া দেখিয়া বলিল—ওঠে নাই ভাল। বলিয়া আবার সেটা তরুর মুখের উপর চাপাইয়া দিল। তরুর শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া মত্ত তারণকে একটা ধাক্কা দিল। নেশার উত্তেজনায় দুর্ব্বল তারণ পড়িয়া গেল—সেই অবসরে দরজা খুলিয়া ছুটিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বাহিরেও নিষ্কৃতি ছিল না—সেখানে শাশুড়ী পাহারা দিতেছিল বাঘিনীর মত। তারণের ঘরের দরজায় অতি ক্ষিপ্রভাবে শিকল দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া বধূকে আটক করিয়া কহিল—পালাবি কোথায় শুনি? হারামজাদী, স্বামীকে ফেলে দিয়ে তুমি পালাবে? কেলেঙ্কারী করবে আমার?

তরু সভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী তাহাকে সেই অবস্থাতেই আপনার ঘরে বন্ধ করিলেন। তরুর কাঁদিবার সাহস ছিল না, কিন্তু কান্নার আবেগে বুক যেন তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল। সে নিদ্রাহীন চক্ষে আবেগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে ঘরভরা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া পড়িয়া রহিল।

ভোরের দিকে শাশুড়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ও ঘরে তারণের নাসিকা-গর্জ্জনের ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। তরু উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভয়ে যেন সে পঙ্গু হইয়া গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার সে উঠিল। দরজার কাছে আসিয়া অর্গলে হাত দিল।

ধনদাবাবু গ্রামের মধ্যে প্রত্যুষে উঠিয়া থাকেন—অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই তিনি বাহিরে আসেন। সেদিন প্রত্যুষে বহির্দ্বার মুক্ত করিবামাত্র প্রথম দর্শন করিলেন নববিবাহিতা কন্যার কর্দ্দমলিপ্ত মুখ। তিনি শিহরিয়া প্রশ্ন করিলেন—তরু—মা?

তরু উত্তর দিতে গেল, কিন্তু পারিল না—সে এতক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পিতার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

তরুর জীবনের এইখানেই বোধ হয় প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

*　　　　*　　　　*

পরদিন প্রভাতেই তরুর শাশুড়ী বউ লইতে আসিয়া বলিল—আরও পঞ্চাশ টাকা তোমাকে লাগবে বেয়াই। তারণ তো আমার রেগে খুন—বলে, ও পরিবার আমি নোব না। আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

অসহিষ্ণু ভাবে ধনদাবাবু বলিলেন—না।

সবিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া তরুর শাশুড়ী বলিল—না কি ?

এক কথায় ধনদাবাবু বলিয়া দিলেন—মেয়ে আমি পাঠাব না।

তরুর শাশুড়ী বলিল—অ—তা বেশ। কিন্তু গয়নাগুলি আমার দাও। গয়না তো আমার তারণের।

ধনদাবাবু বলিলেন—গয়না আমার মেয়ের।

ইহার উত্তরে তরুর শাশুড়ী চীৎকার করিয়া পথে পথে তরুর গতরাত্রির নৈশ অভিসারের একটা রচিত কাহিনী রচনা করিয়া বাড়ি ফিরিল।

ধনদাবাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন—ও জামাইয়ের আমি মুখ দেখব না। আমার মেয়ের ভাবনা! এক লাখ টাকা দেব আমি তরুকে—বেটা নিজে এসে গড়িয়ে পড়বে—তবে আমার নাম!

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা তাঁহার থাকিল না।

চার বৎসর পরের কথা। তরুর বয়স তখন সতের বৎসর।

তরুর মা সেদিন ধনদাবাবুকে বলিলেন—হ্যাঁ গো, মেয়েটার একটা ব্যবস্থা কর।

ধনদাবাবু বলিলেন—পাঁচ হাজার টাকা দেব আমি তরুকে—ভাবনা কি ?

গৃহিণী বলিলেন—টাকা নিয়ে কি করবে তরু ? কে ভোগ করবে ?

ধনদাবাবু সচকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—হুঁ।

গৃহিণী বলিলেন—জামাইয়ের সঙ্গে কি মাথা তুলে চলা চলে, যার পায়ে ধ'রে মেয়ে দিয়েছ! তরুর দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

ধনদাবাবু কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় নিজেই গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন—তরু তো বেশ রয়েছে—কেবল দেখলাম আজকাল বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করে বেশী।

গৃহিণী বলিলেন—ঝগড়া করাটা বুঝি ভাল মনের লক্ষণ?

ধনদাবাবু ডাকিলেন—তরু—তরু!

তরু তখন নীচে ঝগড়াই করিতেছিল—সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে অন্ধকার বাড়িটার প্রাঙ্গণে একা দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—গোপালের মা সব—গোপাল কোলে ক'রে শুয়েছেন! আর আমি—দাসী বাঁদী আমার তো না খাটলে উপায় নেই। আমি তো গোপালের মা নই।

ধনদাবাবু গৃহিণীকে বলিলেন—হুঁ।

তরু তখনও আপন মনেই বকিতেছিল—কাল যে ষষ্ঠী—তা সে উয্যুগও আমাকে করতে হবে? কেন—শুনি? ঝাঁটা মারি ষষ্ঠির মুখে।

*　　　*　　　*

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই ধনদাবাবু গৃহিণীকে বলিলেন—কুমুঠাকরুণকে একবার ডাক দেখি!

গৃহিণী বলিলেন—কেন?

—তারণের মায়ের কাছে একবার পাঠাব।

কুমুঠাকরুণ দৌত্য লইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তারণ আসতে-যেতে রাজী আছে। কিন্তু যেদিন আসবে সম্মানী দিতে হবে পাঁচ টাকা ক'রে। প্রথম দিন কিন্তু দশ টাকা লাগবে।

ধনদাবাবু বলিলেন—দশ টাকা, মোটে দশ টাকা! দশ-পাঁচ-শ দেব আমি। চাঁদির জুতো মারব আর নিয়ে আসব বেটাকে—যাও তুমি কুমুদিদি, নেমন্তন্ন ক'রে এস—রাত্রে সে এখানে খাবে।

কুমু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—টাকা কিন্তু আগাম দিতে হবে।

দশ টাকার দুইখানি নোট বাহির করিয়া তিনি কুমুর হাতে তুলিয়া দিলেন, বিশ টাকা দিলাম—আবার দেব। ভাবনা কি! বাড়িতে নানা আয়োজন হইল। তরু নিজ হাতে শয্যা রচনা করিল।

ছোট ভাজ রসিকতা করিয়া বলিল—ঠাকুরঝিকে আজ ভাই বড় খুশী খুশী দেখছি।

ফিক করিয়া হাসিয়া তরু বলিল—মরণ আর কি!

বড় ভাজ যত্ন করিয়া কেশবিন্যাস করিয়া দিল।

রাত্রে শুইতে যাইবার সময় সে আঁচলের খুঁট খুলিয়া কয়টা বেলফুল খোঁপায় পরিয়া লইল। কখন গোপনে সে কৃষ্ণবাবুর বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

প্রভাতে উঠিয়া তরু দেখিল—শয্যাশূন্য, তারণ কখন উঠিয়া চলিয়া গেছে। দেওয়ালে ঝুলানো আয়নায় সে বিশৃঙ্খল মাথাটা ঠিক করিয়া লইতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল—তাহার কানের একটা মাকড়ী নাই। বিছানা খুঁজিতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু তবুও একবার খুঁজিয়া দেখিল।

সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত, মাকড়ী পাওয়া যাইবে না—পাওয়া গেলও না।

কয় দিন পরে আবার সেদিন সকালে কুমুঠাকরুণকে দেখিয়া তরু মাকে বলিল—কুমুঠাকরুণ কেন এসেছিল মা?

মা বলিলেন—তারণকে নেমন্তন্ন করতে পাঠালাম।

তরু বলিল—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব মা।

সবিস্ময়ে মা প্রশ্ন করিলেন—কেন?

তরু বলিল—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পর কুমু আসিয়া বলিল—কই গো তরুর মা, টাকা পাঁচটা দাও বাপু—আগাম না হ'লে তোমার জামাইয়ের চলবে না।

তরুর মা বাক্স খুলিতেছিলেন—তরু আসিয়া তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া

বলিল—আমাকে আর আত্মহত্যা করিও না মা, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

মা সস্নেহে তরুকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—কেন, সে কথা আমায় বলবি না তরু?

মায়ের আকর্ষণেও তরু উঠিল না, সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া মায়ের পায়ে মুখ লুকাইয়া বলিল—চোর চোর, মা, সেদিন আমার মাকড়ী চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে।

*   *   *

আট বৎসর পরের কথা—

পশ্চাতের পটভূমির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে। জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ধনদাবাবুর বড় বাড়িটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ হইয়াছে; ধনদাবাবুও নাই—তাঁহার স্ত্রীও নাই। বাড়িটা চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে—তিন ভাইয়ের তিন অংশ, তরুর এক অংশ। তরুকে তিনি দিয়া গিয়াছেন নগদ পাঁচ শত টাকা ও হাজার-দেড়েক টাকা মূল্যের জমি। লাখ-পঞ্চাশ, হাজার-দশ, হাজার-পাঁচ, হাজার, ওটা ছিল ধনদাবাবুর স্বভাবসিদ্ধ আস্ফালনের অঙ্গ। বড় ভাইয়ের বাড়ি বন্ধ, বড়ভাইও নাই, ছেলেটিকে লইয়া বড় ভাজ ভাইপোর কাছে গিয়া আছেন। মেজ ভাই এখানকার বাসই তুলিয়া দিয়াছে—সমস্ত বিক্রয় করিয়া সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া বাস করিতেছে। থাকিবার মধ্যে আছে তরু ও তরুর ছোটদাদা। তরুও স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতিয়াছে। ধনদাবাবুর শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া যাওয়ার কিছুদিন পর সেদিন তরুর দূরসম্পর্কীয়া এক ননদ আসিয়া ডাকিল—বৌ, রয়েছ না কি?

তরু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে?

ননদ রসিকতা করিল—কুটুম হে কুটুম—সন্দেশ বার কর।

তরু বলিল—এস—'সব

ননদ বলিল—পাল্কী এনেছি—নিতে এলাম তোমাকে।

একখানা আসন পাতিয়া দিয়া তরু বলিল—ব'স।

বসিয়া ননদ চারিদিক দেখিয়া বলিল—বেশ বাড়ি হয়েছে। কারু সঙ্গে কোন লেপ্‌চ নাই।

তরু শুষ্কস্বরে বলিল—হুঁ।

ননদ বলিল—আর কি দিয়ে গেল বাবা? কেউ বলছে পাঁচ হাজার, কেউ বলছে দশ হাজার—তা অবিশ্বেসের তো কথা নয়—বাপ তো তোমার বড় বাপই ছিল।

তরু গম্ভীর ভাবে বলিল—পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

ননদ বলিল—তা আমাকে কিছু শিরোপা দিও ভাই, আমি সুখবর এনেছি।

তরু কোন উত্তর দিল না—সে সুখবরটার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কেহ কোথাও ছিল না—তবুও অনাবশ্যক ভাবে মৃদুস্বরে ননদ গোপন সংবাদটি প্রকাশ করিল—দাদার মন টলেছে হে—তোমার কপাল খুলেছে।

বিচিত্র হাসি হাসিয়া তরু বলল—তাই না কি?

—হ্যাঁ, তাই তো বললাম—তোমাকে নিতে এসেছি।

—ও।

—তা হ'লে কবে যাবে বল—এ মাসের ২০শে, ২৫শে, ২৭শে এই তিনটি দিন আছে।

তরু কঠিন স্বরে অপ্রত্যাশিত রূঢ়ভাবে এবার জবাব দিল—বলতে তোমার লজ্জা লাগল না ঠাকুরঝি—ছি—ছি। এজন্মে তোমার দাদাকে তপস্যা করতে বল গে—আসছে জন্মে যাব। আমার টাকার লোভে নিতে এসেছ—আবার দু-দিন পরে টাকা কটা কেড়ে নিয়ে আর একটা কলঙ্ক দিয়ে বিদেয় ক'রে দেবে, কেমন?

ননদ মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল। তরু পূজার জন্য ফুল বাছিতে

বসিল। সে এখন নিত্য নিয়মিত পূজা করে—ব্রত-নিয়মের কোনটি সে বাদ দেয় না।

ছোট ভাজ আসিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তরু বলিল—কি?

বৌটি ভয়ে ভয়ে বলিল—তোমার দাদা একবার ডাকছে!

কর্কশভাবেই তরু উত্তর দিল—কেনে?

—সে তো আমি জানি না ভাই।

—তুমি জান না—আমি জানি—বল গে টাকা আমি দিতে পারব না।

বৌটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই ইমনকল্যান ভাঁজিতে ভাঁজিতে ছোট দাদা আসিয়া বিনা-ভূমিকায় বলিল—পাঁচটা টাকা দে তো তরু।

তরু ভাইকে দেখিয়া একটু কোমল হইয়া উঠিল—এই ছোটদাদাকে সে বাল্যকাল হইতেই বড় ভালবাসে। তরু একটু কোমলকণ্ঠেই বলিল—টাকা আমার নাই ছোটদা।

ছোটদাদা বসিয়া পড়িয়া থামের গায়ে টোকা দিয়ে বোল বাজাইতে বাজাইতে বলিল—আঃ, আজ একটা গানের মজলিস বসবে—একজন সেতারী ওস্তাদ এসেছে।

তরু বলিল—এই ক'রেই তুমি সব নাশাবে ছোটদা।

ছোটদাদা আংটিটা খুলিয়া দিয়া বলিল—এইবার দিবি তো!

আংটিটা কুড়াইয়া লইয়া তরু পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দিল। খুশী হইয়া ছোটদাদা টাকা লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তরু আবার ডাকিল—ছোটদা—নিয়ে যাও তোমার আংটি। আংটিটা সে ভাইয়ের দিকে ফেলিয়া দিল।

দিনকয়েক পর—সেদিন তখন সে রান্না করিতেছিল। কাহার গলার সাড়া পাইয়া সে বুঝিল, ছোটদাদা আজও আবার টাকার জন্য আসিয়াছে। সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে শক্ত কথার সারি সাজাইয়া তুলিতেছিল সে।

—একটু আগুন দাও দেখি।

তরু চমকিয়া উঠিল—মুখ ফিরাইয়া দেখিল—বিপদতারণ নির্লজ্জ ভাবে দাঁত মেলিয়া হাসিতেছে।

হি-হি করিয়া হাসিয়া বিপদতারণ বলিল—চম্‌কে উঠলে যে—ভূত নাকি আমি?

দেওয়ালে ঠেস দিয়া তরু কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তারণ বলিল—বেশ ঘরদোর হয়েছে। তা আমাকে একদিন নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন কর।

তরু এবার বলিল—না।

তারণ কৃত্রিম ভয়ে একটু পিছাইয়া আসিয়া বলিল—ও রে বাপরে। সাপিনী রে—ফোঁস্!

তরু কিন্তু এ রসিকতায় হাসিল না।

তারণ বলিল—তা হ'লে কবে নেমন্তন্ন করছ বল?

তরু বলিল—বললাম তো—না।

—না! কেন শুনি?

তরু অনুচ্চ কণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত বলিল—চোরকে আমি বড় ঘেন্না করি। এক মুহূর্ত্তে তারণের কালো মুখও কেমন অস্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিল। মাথাও নত করিতে হইল।

তরু বলিল—মাকড়ী তুমি চাইলে না কেন?

তারণ বলিল—চাইলে তুমি দিতে?

—চেয়ে দেখলে না কেন তুমি? মুখে মাটির ছাঁচ তুলেছিলে, তবু তো আমি রাগ করি নি!

তাহার দুটি চোখ জলে টল্ টল্ করিতেছিল।

তারণ আসিয়া তাহার দুটি হাত ধরিয়া অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল—আমাকে মাফ কর তরু।

তরু ঝরঝর করিয়া কাঁদিল শুধু। তারণ তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বার-বার চুম্বন করিল।

তারপর যাইবার সময় বলিল—রাত্রে আমার নেমন্তন্ন রইল এখানে।

* * *

জীবনের এই তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার সুখের চিত্র আঁকিয়াছিলেন। বিপদ-তারণ তাহাকে ধরা দিল, সত্য সত্য স্বামীর মতই ধরা দিল। অর্থ চাহিল না—সম্পদ চাহিল না—আপনার মত করিয়াই সমস্ত জোতজমার তদারক করিল, তরুর সেবাও লইল—শাসনও মানিল। মাস-চারেক পর সেদিন তারণ মাঠ হইতে ফিরিয়া দেখিল তরু শুইয়া আছে। প্রশ্ন করিয়া জানিল, তাহার জ্বর হইয়াছে। তারণ নিজেই রান্না করিতে বসিল।

তরু বলিল—ছোটবৌ যে নেমন্তন্ন ক'রে গিয়েছে সকালেই। জ্বর দেখে বললে—ঠাকুরজামাই তা হ'লে আমার বাড়িতেই খাবেন।

দুম্ করিয়া কড়াটা নামাইয়া দিয়া তারণ বলিল—বাঁচলাম বাবা। একটান তামাক খাই বরং কাজ দেবে। আজ কিন্তু একটা টাকা দিতে হবে—অনেক দিন মদটদ খাই নাই। কে—কে গো?

তরুর ননদ প্রবেশ করিয়া বলিল—তোমাকে একবার ডাকছেন দাদা, কটি লোক এসেছে বাড়িতে। দাদা আজ বাড়িতেই খাবে বৌ।

তারণ বলিল—লোক—কে রে বাপু? কার ধার ধারি আমি!

তরু বলিল—দেখেই এস না বাপু!

তারণ গেল, কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যেও আর ফিরিল না। অপরাহ্নে ছোটবধূ আসিয়া বলিল—ঠাকুরজামাই ফেরেন নি ঠাকুরঝি?

তরুর জ্বর ছাড়িয়া আসিতেছিল; সে বলিল—সেই জলখাবার বেলাতেই গিয়েছে বাড়ি—কে লোক এসেছে। এখনও তো ফিরল না। কাউকে যে পাঠাব এমন লোক নাই।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বৌ বলিল—তোমার ঝলকার সতীন এসেছে।

তরু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে বললে ?

অপরাধিনীর মত বৌটি বলিল—পাড়াতেই শুনলাম—খবর সত্যি।

তরু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—দেখি কিছুক্ষণ, তুমি ছোটদাকে একবার ডেকে দিও ভাই।

ডাকিতে কিন্তু পাঠাইতে হইল না—তারণ নিজেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিল।

তরু প্রশ্ন করিল—ঝলুকার বৌ এসেছে ?

তারণ বলিল—হ্যাঁ। দেখ কেনে, বলা নাই, কওয়া নাই ড্যাং ড্যাং ক'রে এক-কাপড়ে এসে হাজির। শালারা মদ খাইয়ে বিনা পয়সায় বিয়ে দিয়েছে ; এখন বলে—ভাত কাপড় দাও, নিয়ে ঘর কর।

তরু চুপ করিয়া রহিল। তারণ বলিল—দিলাম বিদেয় ক'রে। বলে ভেসে যাবে ; আমি ব'লে দিলাম, গলায় কলসী বেঁধে দিও, ডুবে যাবে—ভেসে যাবার ভয় থাকবে না।

তরু বলিল—ছি, ওই কি বলে গো ?

আবার কিছুক্ষণ পর তরুই বলিল—আজই কেন বিদেয় ক'রে দিলে বল তো ? না হয় একটা রাত থাকত। না হয় সম্মানীটা আমি দিতাম।

তারণ বলিল—একটা টাকা দাও দেখি, একটা বোতল আনব আজ।

তরু বলিল—বাক্সটা আন না, লক্ষ্মী !

তারণ বাক্স আনিলে তরু একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—রেখে এস এটা, আমি পারছি না। তারণ তখন বহির্দ্বারের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে ; ফিরিয়া চাহিবার তাহার সময় ছিল না। তরু শুধু হাসিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তরু ডাকিল—ছোটবৌ ! ছোটবৌ আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—কেমন আছ ঠাকুরঝি ? ঠাকুরজামাই কই ?

তরু বলিল—মাঠে গিয়েছে। আমি ভালই আছি। আজ আমরা দু-জন এবেলা তোমার কাছেই খাব। আর ওবেলার জন্যে কিছু মাছ আনিয়ে ভেজে রেখ তো ভাই। বাক্সটা বের ক'রে আন, পয়সাটা দি, নিয়ে যাও।

ঘরে ঢুকিয়া ছোটবৌ বলিল—বাক্স কই ঠাকুরঝি? এ কি তোমার সিন্দুকের তালা খোলা কেন?

তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া তরু দেখিল—কাঠের হাত-বাক্সটা নাই, সিন্দুকের তালাটা খোলা, ঝুলিতেছে।

ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সিন্দুকের ডালা খুলিয়া দেখিল, শূন্য—গহনার বাক্স টাকার বাক্স কিছুই নাই।

তরু থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

বৌ ডাকিল—ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি!

তরু বলিল—গোল ক'রো না, গোল ক'রো না বৌ। গেছে যাক।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা বোধ করি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

* * * *

তরু আবার পূর্ব্বের মত জীবন আরম্ভ করিল। তিল তিল করিয়া সঞ্চয়ে আপনার ভাগ্য আবার সে গড়িয়া তুলিতেছিল—আবার সেই পূজা-অর্চ্চনা, বারব্রতের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

কিন্তু কঠোরতা তাহার পূর্ব্বের চেয়ে অনেক গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সংসারে করুণা সে কাহাকেও করে না। ছোটদাদার এখন যথেষ্ট অভাব—একে একে সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছে—তবু একটি পয়সা সাহায্য সে করে না। দু'শত টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায়ে সুদ সে একটি পয়সা ছাড়ে না। তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সে ঐ শূন্য সিন্দুকটি পূর্ণ করিবার জন্য কঠোর ভাবে নিয়োজিত করিয়া বসিল।

তারণ ঝল্‌কার বৌকে লইয়া সংসার পাতিয়াছে। কয়টি ছেলে-মেয়েও হইয়াছে। তরু পাড়ার সে-দিকটা মাড়ায় না পর্য্যন্ত। কিন্তু মুখে সে কোনদিন একটা কথা বলিল না।

দশ বৎসর পর।

সেদিন ছোটদাদা আসিয়া বলিল—তরু একটি কথা বলছিলাম তোকে।

বাধা দিয়া তরু বলিল—নিজে খেতে পাই না আমি, আমি কোথা সাহায্য করতে পাব বল?

ছোটদাদা নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। বলিল—সে কথা ঠিক তোকে বলতে আসি নাই আমি তরু—অন্য কথা বলছিলাম—তা থাক।

সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার কথাগুলির মধ্যে কণ্ঠস্বরের দীনতায় তরু আজ একটু বেদনা বোধ না করিয়া পারিল না। ছোটদাদা চলিয়া গেল। তরুর আজ মনে হইল, ছোটদাদা যেন বড় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ বয়স তো তাহার বেশী নয়! চল্লিশ এখনও পূর্ণ হয় নাই! সে দরজাটায় কুলুপ বন্ধ করিয়া ছোটদাদার বাড়ি চলিল।

কার্তিক মাস, রাস-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাবুদের গোবিন্দ-মন্দিরে রোশন-চৌকি বাজিতেছে। তরু শুনিল, ছোটদাদা বলিতেছেন—কি রাগিণী আলাপ করছে জান?—বাগেশ্রী।—বলিয়া নিজেই গুন-গুন করিয়া রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। তরু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

ছোটদাদা বলিল—তরু? আয়—ব'স।

তরু ছোটদাদাকে দেখিতেছিল—সত্যই ছোটদাদার ঢেউ-খেলানো চুল আজ সাদা রং ধরিয়াছে—তাহাতে আর সে বিন্যাসও নাই।

কাঁচা সোনার মত রং তামাটে হইয়া আসিয়াছে—বাল্যের ব্যায়ামপুষ্ট সবল দেহ যেন জীর্ণ শিথিল—গায়ের চামড়ায় কুঞ্চন ধরিয়াছে।

ছোটদাদা বলিল—কেটেছে তাল বেটাচ্ছেলে।

তরু বলিল—রাগ করেছ ছোটদা?

হাসিয়া ছোটদাদা বলিল—না রে, রাগ করব কেন?

—তবে কি বলছিলে, না ব'লে চলে এলে যে?

—তুই শুনলি কই—আঃ আবার তাল কেটেছে—দাঁড়া তো ব'লে আসি বেটাকে!

তরু বলিল—কি কথা ছিল ব'লে তবে যেতে পাবে। চিরকালই কি মানুষের একভাবে যায়? ছি—ছি—ছি!

ছোটদাদা বলিল—বলছিলাম কি—ছোটবৌ বড় কাতর হয়ে পড়েছে—মানে ওর ছেলে হবে, তা জানিস তো?

হাসিয়া ফেলিয়া তরু বলিল—হ্যাঁ, তা জানি।

ছোটদাদাও একটু বোকার মত হাসিয়া বলিল—মানে বেশী বয়সে ছেলে হবে—আর আজকাল হয়েই আছে। মানে—কাল থেকেই শরীর যেন—আঃ বল না গো তুমি!

তরু আবার হাসিয়া বলিল—তুমিই বল।

ছোটদাদা বলিল—তাই বলছিলাম—রান্নাটা যদি এক জায়গায় এ ক'দিন তুই চালিয়ে দিস, তবে বড় ভাল হয়।

তরু ছোটবৌয়ের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিল—শরীর কি ভেঙেছে ছোটবৌ?

ছোটবৌ বলিল—হ্যাঁ, ভাই কেমন যেন—

তরু ভাইকে প্রশ্ন করিল—দাই এখুনি ব'লে রেখেছ তো ছোটদা?

* * *

সেইদিনই রাত্রে ছোটবৌ একটি পুত্র প্রসব করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ছোটদাদা ছলছল নেত্রে তরুর দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে তরু?

তরু কোন কথা বলিল না—সে আপনার বাড়ী চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরেই আবার ফিরিয়া দুইটি টাকা ভাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ভরসা দিয়া বলিলেন—বিশেষ কিছু ভয় নেই।

নবজাত মানবটি তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। ডাক্তার তাহাকে কোলে লইয়া বলিলেন—বাঃ বড় সুন্দর খোকা হয়েছে! এর যে একটা ব্যবস্থা করা দরকার—এক আধ দিন তো নয়, এখন মাসখানেকই ধ'রে রাখুন।

তরু অসঙ্কোচে আঁতুড়ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই বোধ হয় চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি।

*　　　*　　　*

ছোটবৌ ভাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মা হওয়া তাহার হইল না। সেই হইল ধাত্রী—আর তরু হইল মা।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনে একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। যে কয়দিন সে তারণকে জীবনে নিবিড় ভাবে পাইয়াছিল, সে কয়দিনের মধ্যেও তাহার এত মিষ্ট কথা কেহ কোন দিন শুনে নাই। জীবনের স্নেহের সুধার ভাণ্ডার সে যেন উজাড় করিয়া দিল। শুধু স্নেহের নয়—তাহার জীবনের সঞ্চয় সামর্থ্য সমস্ত দিয়া ছোটদাদার সংসারটি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিল। সঙ্গীতবিৎ ছোটদাদাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল—আঃ, বাঁচলাম আমি তরু—তরুর ছায়ায় এবার জুড়োব আমি। তরু এখন আর রাগ করিল না—হাসিয়াই বলিল, ওই শিখেছিলে শুধু কথার ঝুড়ি—'আর 'কত্তে ধাগিনাক্।'

ছোটদাদাও হাসিয়া বলিলেন—আয়, আজ একবার তোর মাথায় কত্তে ধাগিনাক বাজিয়ে দি।

—খবরদার ছোটদা,—ভাল হবে না বলছি। খোকার দুধ গরম করব, সরো।

ছোটদাদা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলে নাই। তাহার সম্পত্তি যাহা কিছু সবই প্রায় গিয়াছে—এখন ঋণ পর্ব্বতপ্রমাণ। তরুর সঞ্চয় ও সম্পত্তি হইতে বহুদিন পরে পরিবারটির অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই অকালবৃদ্ধ ছোটদাদার শরীরে চিক্কণতা দেখা দিল। তরুর তাড়ায় মাঝে মাঝে জোতজমার তদারক করিতে যাইতে হয়—অন্য সময়ে আপনার দাওয়াটির উপর বসিয়া 'কত্তে ধাগিনাক' করেন—কখনও বা ইমন-কল্যাণের রাগিণী একটু হেরফের করিয়া একটা নূতন সুর সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন।

মধ্যে মধ্যে বলেন—তরু, তুই আপত্তি করিসনে—আমি ওস্তাদি করতে আরম্ভ করি। দশ টাকা আসবে—আমার পেটটাও বাইরে বাইরে—

তরু বলে—হ্যাঁ, নেশাভাংটা চলবে, সেইটাই হ'ল আসল কথা তোমার ছোটদাদা।

ছোটদাদা অপ্রতিভের মত হাসে।

তরু বলে—না, চুল রেখে, গাঁজা খেয়ে বেড়াতে হবে না ছোটদাদা। বড় হলে ছেলেটা যাতে বাপ ব'লে পরিচয় দিতে পারে তার মুখ রেখে যাও।

ছোটদাদা আরও কি বলিতে চায়—কিন্তু তরু শোনে না, খোকার কোন পরিচর্য্যার সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অজুহাতে সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

বৎসর-তিনেক পর ছোটবৌ আর একটি কন্যা প্রসব করিল।

তরু হাসিয়া বলিল—নাও ছোটদা—মহাজন হ'ল তোমার!

ছোটদাদা হাসিয়াই উত্তর দিলেন—মহাজন নয় বোন—পাথর। সংসার-সমুদ্রে কোনরকমে ভাসছিলাম—এইবার বুকে চাপল পাথর।

তরু সজল চক্ষে বলিল—ছি, ছোটদা! জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তোমার ভাবনা তো মিছে।

ছোটদাদা শুধু হাসিল।

তরু বলিল—ওর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না ছোটদা—আমাকে ভার দিও—কুলের মাথা খেয়ে আমি ওকে সুখী করব।

ছোটদাদা হাসিয়াই উত্তর দিল—আমার ভারই তোর হাতে তরু। সংসারের হাটে ভারী তো দূরের কথা ঝাকামুটে হবার সামর্থ্যও আমার নাই। এ সংসারের সব ভারই তোর।

ইহার কিছুদিন পরই একদিন ছোটদাদা সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া সেগুলা ব্যবহারের যোগ্য করিতে বসিল। তরু বলিল—যত বাজে কাজ কি তোমার ছোটদা!

ছোটদাদা বলিলেন—এবার এগুলোকে কাজেই লাগাব তরু। আর তোর কথা শুনব না। মান যাক—তাতে যদি পেট ভরে, তাতে দোষ কি?

তরু এবার আর আপত্তি করিল না। তাহার সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাপকে মনে পড়িয়া গেল—সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। ছোটদাদা তানপুরা ঘাড়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাসখানেক পরে ছোটদাদা ফিরিয়া ডাকিলেন—তরু!

খোকাকে কোলে লইয়া তরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ছোটদাদা!

দশটি টাকা তরুর হাতে দিয়া ছোটদাদা বলিলেন—রাখ।

তরু বলিল—খোকার জন্যে কি এনেছ, দাও।

অপ্রতিভ হইয়া ছোটদাদা বলিলেন—কিছু তো আনি নাই তরু—ও কথা আমার মনেই হয় নাই।

তরু ছেলেমানুষের মত অভিমান করিয়া বলিল—তোমার টাকা তুমি রাখ দাদা—আমার দরকার নাই। বেশ তো, তোমার সংসার তুমি চালাও—খোকার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

বহু কষ্টে ছোটদাদা তরুকে শান্ত করিলেন। মাসখানেক পর আবার ছোটদাদা বাহির হইয়া গেলেন।

মাস ছয়েক পর।

সন্ধ্যার সময় ননদ ও ভ্রাতৃজায়ায় সুখদুঃখের কথা হইতেছিল। তরুর কোলে খোকা, বৌর কোলে ছিল খুকি। ছোটদাদা বাড়িতে নাই, বাহির হইয়া গিয়াছেন। খোকা বায়না ধরিয়াছিল, সে মাতৃস্তন্য পান করিবে।

বৌ বলিল—না ঠাকুরঝি, মেয়েটা তো এক ফোঁটা দুধ পায় না—তার ওপর মাই দুধে ভাগ বসালে ও বাঁচে কি ক'রে বল!

তরু বলিল—ও হে, কুলীনের ঘরের মেয়ে অক্ষয় অমর—দেখছ না

আমাকে! দাও ভাই দাও খোকাকে আমার—একবার দুধ দাও। তাতে তোমার রাজকন্তের কম পড়বে না।

বাহির হইতে কে ডাকিল—কে রৈছেন গো ঘরে?

তরু সাড়া দিল—কে? কোথা বাড়ি?

উত্তর হইল—আমরাই গো—ওস্তাদজীকে নিয়ে এসেছি—অসুখ তেনার।

তরু ছুটিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল—ছোটদাদা গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। সে ব্যাকুলভাবে ডাকিল—ছোটদা—ছোটদা গো!

গোঙাইয়া গোঙাইয়া ছোটদাদা যে কি উত্তর দিল, তরু বুঝিতে পারিল না। সে গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে গো?

গাড়োয়ান বলিল—আজ্ঞে, কবরেজ দেখাল্‌ছিলাম আমরা, ডাক্তারও দেখেছে—এক অঙ্গ পড়ে গিয়েছে ঠাকুরের।

তরু বুঝিল পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাত ভাল হইবার ব্যাধি নয়—ভাল হইল না। পঙ্গু অক্ষম হইয়া ছোটদাদা তরুর স্কন্ধেই বোঝা হইয়া চাপিয়া রহিলেন। তরু চিকিৎসায় কিছু অর্থব্যয় করিল, কোন ফল হইল না।

কিন্তু এততেও তরু দমিল না। তাহার জোতজমা হইতেই নিপুণ বন্দোবস্তে সে সংসারটির অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া চলিল। ছোটদাদা আরও বৎসরখানেক বাঁচিয়া রোগ-ভোগ করিয়া তবে গেলেন। তিনি বোধ করি ছিলেন তরুর জীবনের প্রবলতম মন্দগ্রহ। তাহার পিতা তাহার এত ক্ষতি করেন নাই—তারণও করে নাই—কিন্তু ছোটদাদা তাহাকে পথে বসাইয়া দিয়া গেলেন। জীবনে অমিতব্যয় ছাড়া তিনি আর কিছু করেন নাই—দেহে তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত হইল পক্ষাঘাত—আর যে ঋণ তাঁহার অবশিষ্ট ছিল, তাহাই একদিন সুদে আসলে আদালত-খরচায় ষোল শত টাকার বডিওয়ারেণ্টরূপে আসিয়া হাজির হইল। মহাজন গ্রামের লোক—তিনি তরুর সম্পত্তিটুকুর দিকে লক্ষ্য করিয়া জাল নিক্ষেপ করিলেন।

উঠানে আদালতের পেয়াদা—মহাজন ওয়ারেণ্ট-হাতে অপেক্ষা করিতেছিল। চিন্তা করিবার অবসর ছিল না—তরু ছল-ছল চোখে আসিয়া জোড়হাত করিয়া মহাজনকে বলিল, আমার সম্পত্তিটুকু নিয়েও আপনি দাদাকে রেহাই দেন।

সেই দিনই দলিল লেখাপড়া রেজেষ্ট্রারী হইয়া গেল। তরু মহাজনকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল।

ইহার ঠিক দিন দুই পর। ছোটবৌ বলিল—চাল তো আজ নাই ঠাকুরঝি!

তরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বাহির হইয়া গেল। কত বাড়ির দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়াও সে ফিরিয়া আসিল, সে ধার চাহিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। পথে সহসা তাহার মনে হইল—শোধ করিবে কি করিয়া?

এই লজ্জাতেই সে ফিরিল—অনেকক্ষণ অর্থহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া সে বাড়িই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাড়ির দুয়ারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জড়িত স্বরে রুগ্ন ছোটদাদা চীৎকার করিতেছেন—খিদে—খিদে।

খোকা কাঁদিতেছে—ভাত—খা—বো!

তরু আবার ফিরিল, দ্বিধা তাহার কাটিয়া গিয়াছে। সে সইয়ের বাড়িতে গিয়া সইকে বিনা ভূমিকায় বলিয়া ফেলিল—পাঁচ সের চাল দিতে পারবে সই?—ভিক্ষে—শোধ দেবার তো উপায় নেই।

সই কোন কথা বলিল না—একটি ধামাতে সের-সাতেক চাল ভরিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। এতক্ষণে তরু ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—কি হবে সই?

*　　*　　*　　*

আরও বৎসর-দুয়েক পরে তরুকে দেখা যায়—কিন্তু চেনা যায় না। ছোটদাদা আর নাই—ভিক্ষা এখন তরুর উপজীবিকা। ভিক্ষা করিয়াই সে খোকাকে পড়াইতে সুরু করিয়াছে। বাঁড়ুজ্জেদের পুকুরে সেদিন মাছ-ধরানো

হইতেছিল—খুচরা চুনামাছ। চারিদিকে ছোটলোকের ছেলে-মেয়েদের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে।

পাড়ের উপর একটা পরিষ্কার স্থানে মাছ ঢালিয়া ভাগ হইতেছে।

ছোটলোকের ছেলেগুলোকে ধমক দিয়া কে বলিল—সর্ সর্ এই ছেলেগুলো, পথ দে।

একটা ছেলে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—যেখানে মাছ ধরবে—আম পাড়ছে—সেইখানেই ঠাক্‌রুণের ভাগ আছে।

তরু একটি কচুপাতা হাতে পথ খুঁজিতেছিল। ভিড়ের ভিতরে আসিয়া সে বলিল—ছোটবাবু মাছ দুটো দাও বাপু, ছেলে কাঁদছে ঘরে।

বারব্রতে সে সধবা খাইয়া ব্রতদান গ্রহণ করিয়া ফেরে। সেদিন যোগেন গাঙ্গুলীর স্ত্রীর এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত। তরু আগে হইতেই গাঙ্গুলী-গিন্নীকে ধরিয়াছিল—সধবা তুমি আমাকেই কর দিদিমা।

গাঙ্গুলী-গিন্নী মুখ এড়াইতে পারিলেন না, দয়াও হইল। গাঙ্গুলীর ভাইপো শুধু বলিল—না—না ও ছ্যাঁচড় মেয়েটাকে আবার পূজো কেন? ভিক্ষে বরং দাও তো কিছু দাও।

গাঙ্গুলী-গিন্নী কিন্তু বলিলেন—আহা বাবা—দুঃখী ব'লে যা তা বলতে নাই—ছি।

ব্রতের দিন তরুকে আপনার শয়ন-ঘরে বসাইয়া, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নূতন শাড়ী পরাইয়া দিলেন—সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া সুগন্ধ তেলে চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, পায়ে আলতা পরাইয়া দিয়া নানাবিধ মিষ্টান্নভরা পাত্র সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—খাও।

তরু একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—বাড়ি নিয়ে যাই দিদিমা—ছেলেগুলো আছে—বিধবা বৌটা আছে।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—না না—তুমি ওগুলো খাও তরু, আমি ছেলেদের জন্যে আলাদা এনে দিচ্ছি।

তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নির্জ্জন ঘরে তরু পরমতৃপ্তিভরে খাইতে খাইতে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। ঘরের চারিদিকে সুশোভন প্রাচুর্য্য! কিছুই তরুর অপরিচিত নয়—একদিন এ সবই তাহাদের ছিল। ছবি, আলমারী, পুতুল, খাট, বিছানা—সবই সে ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার পক্ষে সবই অপরূপ। পূর্ব্বদিকের খোলা জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া সমস্ত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

বালিশের নীচে ওটা কি? রৌদ্রাভায় আগুনের মত রাঙা—ধক ধক করিতেছে। এক মুহূর্ত্তে তরুর সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল—সে চিলের মত ছোঁ মারিয়া সেটাকে টানিয়া হইল। সোনার চেন তাগা এক ছড়া!

তাহার বুকের মধ্যে যেন রেলগাড়ী চলিয়াছে! থর থর করিয়া সমস্ত অঙ্গ তাহার কাঁপিতেছিল। ঘরখানা যেন ঘুরিতেছে! তরু দ্রুতপদে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

গাঙ্গুলী-গিন্নী একটা ঠোঙ্গা হাতে উপরে যাইতেছিলেন—পিছনে তাহার ভাসুরপো।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—খাওয়া হয়ে গেল তোমার? ভাসুরপো অসহিষ্ণুভাবে বলিল—কোথা রেখেছ—আমাকে বল না—আমি বার ক'রে নোব।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—তোমার বাবা, ঘোড়ায় চ'ড়ে কাজ করা স্বভাব—মাথার বালিশের নীচেই আছে তোমার তাগা, নাও গে।

সে চলিয়া গেল। ভাসুরপো বলিলেন—কোথায় কাকীমা, পাচ্ছি না যে!

বিরক্তভাবে গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—বালিশের নীচে—ভাল ক'রে চোখ মেলে চেয়ে দেখ। আচ্ছা, আমি যাই।

তরুর হাতে ঠোঙ্গাটা দিয়া তিনি বলিলেন—এস ভাই। তরু দ্রুতপদে নামিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কম্পিত পদে তাহার গতি ব্যাহত হইয়া যাইতেছিল। উপরে তাহারা খুঁজিতেছে। হয়ত—সেই মুহূর্ত্তে বাড়ির

ভিতর হইতে ডাক আসিল—তরু—তরু এই মাগী। তরু তখন গাঙ্গুলীদের বাড়ির ঠিক বাহিরে। তরু এদিক-ওদিক চাহিয়া তাগাটা বাহির করিয়া গাঙ্গুলীদের নর্দ্দমায় তরল পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তখনও সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

দ্রুত পদধ্বনির সঙ্গে গাঙ্গুলীবাবুর ভাইপো আসিয়া বলিল—বের কর্ তাগা—বের কর্ বলছি।

পিছন হইতে গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—তরু!

তরু কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখে ফুটিল না।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—নিয়ে থাক তো দাও তরু—পাঁচটা টাকা আমি দোব।

তরু তবুও নির্ব্বাক।

গাঙ্গুলীবাবুর ভাইপো চীৎকার করিয়া ডাকিল—মোক্ষদা—মোক্ষদা! মোক্ষদা বাড়ির ঝি। সে আসিতেই তাহাকে হুকুম হইল—দেখ তো মাগীর কাপড়চোপড় খানাতল্লাস ক'রে।

তরু শিহরিয়া উঠিল—তাহার হাত হইতে খাবারের ঠোঙাটা পড়িয়া গিয়া সন্দেশগুলা গড়াইয়া পড়িল!

মোক্ষদা তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

যোগেন গাঙ্গুলীকে তরু যে পত্র দিয়াছিল—তাহাতে ওই তাগার কথাই লেখা ছিল। লেখা ছিল—আপনাদের তাগা—আপনাদের নর্দ্দমার মধ্যে পড়িয়া আছে।

বায়ুবর্ষ

যাহাকে বলে 'অজ পাড়াগাঁ'; মজিদপুর সেই 'অজ পাড়াগাঁ'। পায়ে চলা পথ ভিন্ন এখনও এ গ্রামে প্রবেশের জন্য গাড়ীর পথ তৈয়ারী হয় নাই। জামা গায়ে, জুতা পায়ে কোন বিদেশী গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের পথচারী কুকুরগুলা লাঙ্গুল গুটাইয়া চীৎকার করিতে করিতে দূরে পলাইয়া যায়। পথের উপর খেলায় নিবিষ্ট দিগম্বর বালকের দল সভয়ে সসম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া এক পাশে দাঁড়ায়, তারপর পথিকের পিছনে পিছনে গ্রামপ্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। অল্প কিছুদিন আগে এখানে একটি সরকারী ইঁদারা তৈয়ারী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে জল পর্য্যন্ত লোকে এখনও খায় না; বলে, ইঁদেরার জল নোণা,—খেলে পেটে নোণা ধরবে। এমনি পাড়াগাঁ এই মজিদপুর।

এ গ্রামে ইঁট তৈয়ারী করিতে নাই, কয়লা পোড়াইতে নাই, পান ছাড়া অপর কোন প্রয়োজনে চূণ ব্যবহার করিতে নাই, শেয়ালে ছাগল ধরিয়া লইয়া গেলেও তাড়া করিতে নাই—কারণ শেয়াল নাকি সাক্ষাৎ ভগবতী। এমনই ক্ষুদ্র গ্রামখানা অকস্মাৎ একদিন বিপুল চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঠিক যেন ঘনপল্লব আচ্ছন্ন কোন একটা ছোট ডোবায় আকাশ হইতে কে একটা বিশ মণ ওজনের পাথর ফেলিয়া দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে পঙ্কিল শীতল বদ্ধ জল ভয়ে বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইতে চায়, কিন্তু পারে না। গ্রামের লোকগুলির ঠিক সেই অবস্থা, উপায় থাকিলে তাহারা হয়তো পলাইয়াই যাইত।

তাহাদের দোষ নাই—তরুণ এম-এ পাশ-করা জমিদার আসিয়াছেন। সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙের দুইটা গ্রে-হাউণ্ড—টম ও বেবি, আর গাদাখানেক বই। জমিদার তাহাদের ভয়ের বস্তু হইলেও অপরিচিত জন নয়। তাহারা জমিদার ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছে—প্রকাণ্ড বড় বড় পাগড়ী বাঁধা চাপরাশী, ফুরসী, গড়গড়া, বোতল বোতল কারণ, অকারণ গর্জ্জন, এসবের সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় নাই। কিন্তু গাদাখানেক বই ও

কুকুরপ্রিয় হেমাঙ্গবাবুর মত জমিদার তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ; তাহার উপর যেদিন গোমস্তা ঘোষণা করিয়া দিল যে, বাবু কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, কাহারও নজরাণা লইবেন না, খাজনার কথাও বলা চলিবে না,—সেদিন তাহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিন্তু বিস্ময়ের অপেক্ষা ভয় হইল আরও বেশী।

হেমাঙ্গবাবু সখ করিয়া মহলে বিশ্রাম লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু পড়াশুনা করিবারও অভিপ্রায় আছে। হেমাঙ্গবাবু কাছারীর প্রাঙ্গণে পদচারণা করেন—দূর হইতে প্রজারা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখে। ছেলেরা আঙ্গুল দেখাইয়া বলে, হুই দেখ বাবু!

বয়স্ক ব্যক্তিরা ছেলেটার হাতখানা টানিয়া নামাইয়া দিয়া বলে, এ্যাঃ-ই খবরদার! কেহ চুপি চুপি বলে, কি রকম ভাই, আমি তো কিছু বুঝতে লারচি। মোড়ল মাতব্বর যাহারা তাহারা কেহ কেহ সাহস করিয়া যায়, কিন্তু কাছারীর সীমানার বাহিরেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখে—লিকলিকে কালো আঁধার কুকুর দুইটা কোথায়।

যে গলার ডাক—সত্যই মানুষের ভয় হয়।

সে দিন কুকুর দুইটা কাছারীর পিছনের দিকে বাঁধা ছিল, তাই সাহস করিয়া ইন্দ্র মণ্ডল কাছারীতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। হেমাঙ্গবাবু তেল মাখিতেছিলেন, সে হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চরণে ত্যাল দিয়ে দিই আমি!

হেমাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—না, থাক।

ইন্দ্র মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, তবু সে বলিল—আজ্ঞে আমি আপনার পেজা!

হেমাঙ্গবাবু লোক খারাপ নন, তিনি মিষ্ট স্বরেই বলিলেন—কি নাম তোমার?

ইন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, ইন্দচন্দ মণ্ডল, হুজুরের মণ্ডল আমি ; পুণ্যেপাত্ত।

—বেশ বেশ, কিরকম ফসল হ'ল এবার ?

ইন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলিল, ভগমানেই মেরে দিলে হুজুর, মানুষের আর অপরাধ কি !

অকস্মাৎ পিছনের দিকে কুকুর দুইটা গম্ভীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে স্থানটাকে ভয়সঙ্কুল করিয়া তুলিল। কুকুরের ডাক তো নয়, যেন বাঘের ডাক।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরও পাওয়া গেল, ওরে বাপরে, ই যে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলাবে মানুষকে।

হেমাঙ্গবাবু চাকরটাকে বলিলেন, কোন লোক দেখে চেঁচাচ্ছে। গিয়ে ঠাণ্ডা কর তো তুই। কে আসছে, চ'লে আসতে বল, দাঁড়িয়ে থাকলে বেশী চীৎকার করবে। চাকরটা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই একজন অসাধারণ লম্বা জোয়ান আসিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র ভঙ্গিমায় এক সেলাম বাজাইয়া কহিল—সেলাম হুজুর !

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ছয় ফুট, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক জোয়ান, তেমনি পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুইটা করমচার মত রাঙ্গা, লোকটার হাতে তাহারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ দীর্ঘ একগাছা লাঠি। কপালে প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ।

লোকটি হাসিয়া বলিল—আমাদের রুটি মেরে দিলেন হুজুর। আচ্ছা কুকুর পুষেছেন। বন থেকে বাঘ ধরে আনবে ও কুকুরে—লেলিয়ে দিলে লোকের টু টি ছিঁড়ে ফেলাবে।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ও কুকুর শিকার করবার জন্যেই পোষে।

লোকটি বলিল—তা পুষেছেন বেশ করেছেন কিন্তুক—গোলামের মত কুকুর ও লয়। এক লাঠিতেই—গোলাম ও দুটোকেই সাবড়ে দেবে। লোকটাকে দেখিয়া কথাটা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি নাম তোমার ?

আবার একটা সেলাম করিয়া সে বলিল—গোলামের নাম রতন হাড়ি।

হুজুরদের গোলাম আমি। এ চাকলার সকলেই আমাকে চেনে। বলো না গো গোমস্তাবাবু।

হেমাঙ্গবাবু এবার মুখ ফিরাইয়া উপস্থিত ব্যক্তি কয়টির দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—গোমস্তা, ঠাকুর, লদলী, ইন্দ্র মণ্ডল, স্থানীয় ব্যক্তি কয়টির সকলেই ভয়ে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিলেন—লোকটি কে হে রাধাচরণ ?

রাধাচরণ গোমস্তা বলিল, আজ্ঞে রতন হাড়ি, এ চাকলার বড় লাঠিয়াল একজন। জমিদারদের কাজকর্ম্ম পড়লে কাজটাজ করে।

রতন বলিল—হুজুরদের কাছারীতে আমার বাঁধা বিত্তি আছে। সব জমিদারদের কাছারীতেই আছে। দাঙ্গা-দখল, পেজা শাসন যখন যা দরকার হয়, আমি হুজুরদের গোলাম আছিই।

তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখাইয়া বলিল, মুর্শিদাবাদে ফতেসিং পরগণায় জমিদারদের এক দাঙ্গায় এই দেখেন মারলে কপালে তরোয়াল দিয়ে—এক কোপ। গল্ গল্ ক'রে তাজা রক্ত—গরম কি সে রক্ত—চাল দিলে ভাত হয় হুজুর—বেরিয়ে মুখ ভেসে গেল। তবু আমিও ছাড়ি নাই, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বসিয়ে দিলাম লাঠি—ব্যস্, ডিমের খোলার মত চুর হয়ে গেল। সেও পড়ল—আমিও পড়লাম। কিন্তু ঐ লাস পড়তেই ও তরফের সব ভাগলো। আর কখনও সে সীমানায় পা দেয় নাই, তবে আমাকে ছমাস বিছেনায় প'ড়ে থাকতে হয়েছিল।

ইন্দ্র মণ্ডল ধীরে ধীরে কাছারী হইতে বাহির হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—পুলিসে ধরলে না তোমাকে ?

হাসিয়া রতন বলিল—তবে আর হুজুররা আছেন কেন ? এত্তা গোলমাল ক'রে দিলেন যে, পুলিস পাত্তাই পেল না। জলের মত টাকা খরচ করেছিলেন মালিকরা। মামলাতেও জিতে গেলেন আমারই হুজুর। সে সীমেনায় এখন বাবুদের হাজার টাকা আয় বেড়ে গিয়েছে।

একটা সিগারেট ধরাইয়া হেমাঙ্গ প্রশ্ন করিলেন—এখন কোথায় কাজ কর তুমি?

আবার একটা সেলাম করিয়া রতন বলিল—সবারই কাজ করি আমি হুজুর, যার যখন দরকার পড়ে, তলব করলেই গোলাম হাজির হয়; বাঁধি কাজ আমি করি না কোথাও।

—হুঁ, এখন কোথায় এসেছিলে?

—এই হুজুরের দরবারে। হুজুরকে সেলাম দিতে। শুনলাম হুজুর এসেছেন, তাই এলাম। বকশিশের হুকুম হয়ে যাক হুজুর। ওই কুকুর দুটোকে রোজ দুধ ভাত দিচ্ছেন—আমাকেও আজ কিছু হুকুম হোক।

হেমাঙ্গবাবু গোমস্তাকে ইসারা করিলেন, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে একটা টাকা আনিয়া রতনের হাতে দিয়া বলিল—নাও।

রতন পুনরায় অভিবাদন করিয়া বলিল—যখন দরকার হবে হুজুর, কুকুর পাঠিয়ে তলব দিবেন, গোলাম হাজির হবে। যা হুকুম করবেন তাই আমি পারি। হুজুরের যদি কেউ দুষমন থাকে, হুকুম দিলে—। সে ইসারা করিয়া বুঝাইয়া দিল, তাহাকে সে খুন করিতে পারে।

তারপর আবার আরম্ভ করিল—এই এরা সব জানেন—এ চাকলায় কাশীদাস বলে এক হারামজাদা চাষা ছিল। এ চাকলা তার ভয়ে কাঁপত। বেটার পয়সাও ছিল, আর বুকের ছাতিও ছিল। আজ এর জমি কেড়ে নিত, কাল ওর পুকুর ছেঁকে মাছ ধরিয়ে নিত। ওকে ধরে খত লিখিয়ে নিত। শেষ চাকলার জমিদারদের সঙ্গে লাগালে ঝগড়া। গোলামের ওপর ভার হ'ল শেষে। এই বছর দুয়েক আগে কালীপূজার দিন, মাঠের মধ্যে কাশীদাস হয়ে গেল। পা, হাত, মুণ্ডু—সব আলাদা হয়ে পড়ে ছিল মাঠের মধ্যে।

হেমাঙ্গবাবু তাহার অবয়ব এবং সপ্রতিভ ভঙ্গিমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন—কাজ করবে তুমি? আবার সেলাম করিয়া রতন বলিল, হুকুম করলেই পারি।

—না, সে রকম কোন কাজ নয়। আমার কাছে চাকরী করবে তুমি?

—গোলামের পেটটা একটু বড় হুজুর। বলিয়া হাসিয়া রতন পেটে হাত বুলাইল।

—আমার ওই কুকুর দুটো পাকী তিন সের চালের ভাত খায়, এক সের ক'রে দুধ!

—সখের বলিহারী যাই হুজুরের। হুজুর ইচ্ছে করলে আমার মত বিশটে লোক পুষতে পারেন। তা আমি বলব কাল এসে। রতন অভিবাদন করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

গোমস্তা এবার সভয়ে বলিল—ওর মত লোককে ঘরে ঢোকাবেন না হুজুর।

পাচক ব্রাহ্মণটি আবার সাধু ভাষায় কথা বলে, সে বলিল—সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র হুজুর। হেমাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—বাঘও তো লোকে সখ ক'রে পোষে! দেখি না দিন কতক পুষে।

পাচকটি কাতর হইয়া বলিল—কি করবেন ওকে রেখে হুজুর? হুজুরের সুনাম তো দেশময়। কোথাও তো—

বাধা দিয়া হেমাঙ্গ বলিলেন, ওই কুকুর দুটো পুষেছি—কাউকে তো লেলিয়ে দেবার জন্যে নয়, দুটো বন্দুক'ও আমার আছে কিন্তু মানুষকে তো গুলী করিনে। ভয় কি! দেখি না।

গোমস্তা বলিল—ও কি কাজ করবে হুজুর, বাঁধা কাজ করবার ওর দরকারই হয় না। এই সব কাজে রোজগারও করে, আর তা ছাড়া যার বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াল, তারই ঘরে সেদিনের খোরাকটা ক'রে নিয়ে গেল। কেউ তো 'না' বলতে পারে না। ওকে দেখলেই লোকে ভয়ে কাঁপে—যা চায় দিয়ে বিদায় ক'রে বাঁচে।

পাচকটি বলিল—তবু দেখুন গিয়ে হতভাগ্যের চালে খড় নাই, পত্নীর পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র। পাপের ধন কর্পূরের মত উড়ে যায়। সেই যে বলে পাপসঞ্চিত ধন, আর বন্যার জল—এ কখন থাকে না।

গোমস্তার অনুমান কিন্তু সত্য হইল না। পরদিন প্রাতঃকালেই রতন আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন সে আর সেলাম করিল না, হেমাঙ্গবাবুর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, হুজুরের পায়েই আশ্চয় নিলাম আজ থেকে।

* * *

দিন কয়েক পর হেমাঙ্গবাবুর বইয়ের উপর বিরক্তি ধরিয়া গেল। তিনি বন্দুক ও কুকুর দুইটাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বড় শিকার এখানে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তবে খরগোষ ও পাখী এখানে অজস্র। হরিয়াল, তিতির, সরাল পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায়। বন্দুকের শব্দও তাহাদের নিকট অপরিচিত। গোমস্তা বলিল—রতন, তুমি বাবুর সঙ্গে যাও।

রতন বলিল—হুজুরের সঙ্গে চলেছে দুই বাঘ—হাতে বন্দুক, রতন আর ও পাখ পাখুড়ী কুড়োতে কোথা যাবে! ওই শম্ভুকে পাঠিয়ে দাও। সে বেশ মশগুল করিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

হেমাঙ্গবাবু গ্রাম পার হইয়া মাঠে একটা বনফুলের ঝোপের কাছে আসিতেই কি একটা জানোয়ার লাফ দিয়া বাহির হইয়া মাঠে ছুটিল—খরগোষ!

তিনি বন্দুক তুলিয়া ধরিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। খরগোষটা একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তখন টম ও টেবি ছুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে টম আসিয়া নিরীহ জানোয়ারটার ঘাড়ের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ প্রান্তর করুণ-চীৎকারে সকরুণ হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুর মনে হইল, কোন ছাগলছানাকে কুকুরটা ভুল করিয়া বোধ হয় আক্রমণ করিয়াছে, ঠিক এমনি চীৎকার। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, ছাগল নয়—খরগোষই। খরগোষের চীৎকার কখনও তিনি শোনেন নাই। টম আরও গোটা দুই ঝাকি দিতেই জীবটা নীরব হইয়া গেল।

মানুষের বুকের হিংস্রবৃত্তি যখন পাশবিক উল্লাসে জাগিয়া উঠে, তখন

মানুষ আর একরকম হইয়া যায়। একবার হত্যা করিয়া কৃতকার্য্য হইলে আর রক্ষা নাই, হত্যার পর হত্যা করিবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠে। প্রথমেই এমন একটি শিকার করিয়া হেমাঙ্গবাবু মাতিয়া উঠিলেন। শিকার শেষে এক বোঝা পাখী লইয়া যখন কাছারিতে ফিরিলেন, তখন বেলা গড়াইয়া অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে।

স্নান আহার শেষ করিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় গোমস্তা আসিয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া বলিল—খরগোষটার পেটে চারটে বাচ্চা ছিল।

হেমাঙ্গবাবু অনেক শিকার করিয়াছেন, মরা পাখীর পেটে ডিম অনেকবার পাইয়াছেন, সুতরাং এ সংবাদে তিনি বিস্মিত হইলেন না। বরং কৌতূহল-পরবশ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—তাই নাকি? কই চল তো দেখি কেমন?

সত্যই লম্বা একটা চামড়ার থলির মধ্যে পরিপূর্ণ অবয়ব চারিটি শাবক রহিয়াছে, স্পষ্ট দেখা গেল। হেমাঙ্গবাবু বলিলেন, একটু অন্যায় হয়ে গেল। যাক্ গে। বাচ্চা চারটে দিয়ে দাও ওই কুকুর দুটোকে।

রাত্রে আহারের সময় হেমাঙ্গবাবু দেখিলেন, লোকজন সকলেই খাইতে বসিয়াছে, কেবল রতন নাই। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—রতন কই?

গোমস্তা বলিল—সে খাবে না বলেছে, তার শরীর ভাল নাই।

চাকরটা মৃদুস্বরে বলিল—সমস্ত সন্ধ্যাটা সে কেঁদেছে।

—কেন?

—ঐ খরগোষটার পেটের বাচ্চাগুলোকে দেখে।

হেমাঙ্গবাবু অবাক হইয়া গেলেন। একটা নরঘাতী, মানুষের উপর কোন অত্যাচার করিতেও যে ইতস্তত করে না, সে তুচ্ছ একটা পশুর জন্য কাঁদে!

পরক্ষণেই তিনি আবার হাসিলেন। সবই অভ্যাস—যে মানুষ পশু হত্যা করে, সে নরহত্যা করিতে পারে না; যে নরহত্যা করে, সে পশু হত্যা দেখিয়া কাঁদে।

একবার ভাবিলেন, লোকটাকে বিদায় করিয়া দেওয়াই ভাল, পরক্ষণেই মনে হইল, থাক।

রতন হেমাঙ্গবাবুর কাছেই থাকিয়া গেল। সপরিবারে উঠিয়া আসিয়া সে হেমাঙ্গবাবুর এলাকার মধ্যেই বসবাস করিল। হেমাঙ্গবাবুই তাহার সব করিয়া দিলেন। সে এখন খায় দায় আর হেমাঙ্গবাবুর কাছারিতে আসিয়া বসিয়া থাকে। ঐ কুকুর দুইটার সঙ্গে তাহার বড় সদ্ভাব—সেই এখন তাহাদের তদ্বির তদারক করে।

হেমাঙ্গবাবু একটু খেয়ালী মানুষ, দুর্দ্দান্ত ভয়ঙ্কর জানোয়ারের উপর তাঁহার অহেতুকী আকর্ষণ আছে, নতুবা মানুষ তিনি খারাপ নন, জমিদার হিসাবেও তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রজাপালক শিষ্ট জমিদার বলিয়া খ্যাতি আছে। সুতরাং রতনকে এখনও তাহার গুণপনার পরিচয় দিতে হয় নাই। কর্ম্মচারীরা কিন্তু বড় বিরক্ত হয়, ঐ এমন ধারা ভয়ঙ্কর একটা লোককে দেখিয়া তাহাদের আতঙ্কও হয়—আবার রতনের মোটা বেতনের জন্য হিংসাও হয়। তা ছাড়া রতন ইহাদের উপর অত্যাচার করে। এক একদিন এক এক জনের কাছে গিয়া সেলাম বাজাইয়া বলে—আজ মদের ইলেমটা কিন্তুক আপনার কাছে পাওনা গোমস্তা মশাই।

যমের কাছে অনুনয় বিনয় চলে, কিন্তু যমদূতের নিকট অনুনয় করিলে ফল হয় না; তাহারা কেহ একটা আনি কেহ বা একটা দু-আনি ফেলিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

রতন অকৃতজ্ঞ নয়, সে আবার একটা সেলাম করিয়া বলে—বাবুর গোলাম আমি আপনারাও গোলাম। যখন যা কাজ পড়বে হুকুম দেবেন।

নিরীহ কর্ম্মচারী কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলে, আমাদের আবার কাজ কি রতন? রতন বুঝাইয়া বলে—হুজুর, মানুষ হ'লেই কাজ আছে। আপনার দুষমন নাই? যে যেমন মানুষ তার তেমন দুষমন, তার তেমন কাজ। এই দেখেন—রজতপুরের জমিদারের এক সরকার, বুঝলেন, তার ঝগড়া লাগল তার গাঁয়ের

মাতব্বরের সঙ্গে। মশাই, এক বেটা সেঁকরা গোটাকতক পয়সা ক'রে যেন সাপের পাঁচ-পা দেখলে। সরকার আমাকে ধরলে, রতন আমাকে বাঁচাতেই হবে নইলে মান ইজ্জত তো আর রইল না। পঁচিশ টাকা ঠিক হ'ল। তিনদিন না যেতেই বুঝলেন—ছুটে গেল বেটার চালে চালে লাল ঘোড়া।

কর্ম্মচারীটা সভয়ে বলিয়া উঠিল—আগুন!

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে রতন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, লাল ঘোড়া আগুনকেই বলে। তা আপনার একবার নয়, তিন তিন বার। শেষে বেটা সেঁকরা টিন দিলে ঘরে। তখন একদিন করলাম কি জানেন, গাঁয়ের সদর রাস্তার উপর বেটা দাঁড়িয়েছিল, বেটার কানটা ধ'রে গাঁয়ের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ঘোড়দৌড় ক'রে দিলাম।

কর্ম্মচারীটি চুপ করিয়া রহিল, সে আর কথা বাড়াইতে নারাজ, রতনের হাত হইতে রেহাই পাইলেই সে বাঁচে। রতন কিন্তু রেহাই দিল না, সে তাহার ভয়ঙ্কর মুখ আরো বীভৎস করিয়া কৌতুকের হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—লালঘোড়াতে খুব সস্তা হুজুর। এক দেশলাইয়ের কাঠি হ'লেই—ব্যস। এক টাকা দিলে ঘরের এক কোণে দিতাম, দু টাকা দিলে দু কোণে, তিন টাকায় তিন কোণে, চার টাকায় বেড়াজাল—একেবারে ইধার উধার পর্য্যন্ত!

কর্ম্মচারীটি এবার বিরক্ত হইয়া বলিল—কিন্তু যমের ঘরে তো জবাবদিহি করতে হবে রতন।

হি হি করিয়া হাসিয়া রতন বলিল—সে দিন আর কাউকে পয়সা লাগবে না হুজুর, রতন নিজের গরজেই যমের দালানে আগুন লাগাবে। বলিয়া সে এবার উঠিয়া চলিয়া গেল।

* * *

একদিন রতনের কাজ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সম্প্রতি একখানি নূতন মৌজা হেমাঙ্গবাবু খরিদ করিয়াছেন, সেইখানে প্রজাদের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুকেও দোষ দিতে পারা

যায় না, তিনি বিরোধ করিতে চাহেন নাই। বিরোধ করিল প্রজারাই। নজর, সেলামী বা কোন আবওয়াবই হেমাঙ্গবাবু দাবী করেন নাই, তিনি দাবী করিলেন, আইনসঙ্গত প্রাপ্য খাজনা। কিন্তু তাও প্রজারা দিবে না।

তাহারা বলে—খাজনা কিসের? মাঠ চষা—তার আবার খাজনা কিসের? হেমাঙ্গবাবু নালিশ করিলেন। প্রজারা তাঁহার কাছারীতে আগুন দিল। একদিন পথে তাঁহার গোমস্তাকে ধরিয়া কান মলিয়া অপমান করিয়া ছাড়িল। গোমস্তা আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর পায়ে গড়াইয়া পড়িতেই হেমাঙ্গবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি রতনকে তলব করিলেন। রতন আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—এতদিন তুই ব'সে ব'সে খেলি, হাতীর মত তোকে পুষলাম। এইবার কাজ দেখাতে হবে।

রতন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—নতুন মৌজা পলাশবুনি পোড়াতে হবে।

রতন প্রশ্ন করিল—পলাশবুনি?

হ্যাঁ, একধার থেকে আর একধার পর্য্যন্ত—যেন একখানি ঘরও না বাঁচে, বুঝলি? যদি কেউ দেখতেই পায়, কি বাধাই দেয়—তবে তাকে শেষ ক'রে দিয়ে আসবি।

—খুন? রতন হুকুমটা বোধ করি বেশ করিয়া সমঝাইয়া লইতে চাহিল।

—হ্যাঁ, খুন। হেমাঙ্গবাবু সকম্পিত কণ্ঠস্বরেই পুনরায় আদেশ দিলেন!

রতন আর কোন কথা বলিল না, চলিয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তে রতনের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চাহিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁহার মনে হইল, উত্তেজনাবশত এ হুকুম না করিলেই তিনি পারিতেন। কিন্তু রতন কি সে কাজ ফেলিয়া রাখিয়াছে! তৃতীয় দিন তিনি রতনের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, রতন ধরা পড়িল না তো! চতুর্থ দিন তিনি অন্য একজন পাইককে ডাকিয়া বলিলেন—রতনের বাড়ীটা খোঁজ ক'রে আয় তো!

পাইকটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে, কারও দেখা পেলাম না। তার পরিবার কোথা গিয়েছে। ঘরে শেকল লাগান রয়েছে।

কিন্তু রতন তো ফেরে নাই। চিন্তিত হইয়া হেমাঙ্গবাবু পলাশবুনিতেই লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সব সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। অপরাহ্নেই জানা গেল, রতন দ্বিতীয় দিন রাত্রে তাহার স্ত্রীকে লইয়া এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছে। ঘরে তৈজসপত্রের মধ্যে পড়িয়া আছে কয়েকটা ভাঙা হাঁড়ি। পলাশবুনি হইতে সংবাদ আসিল, গ্রামও পোড়ে নাই—রতনও ধরা পড়ে নাই।

হেমাঙ্গবাবু স্তব্ধবিস্ময়ে বসিয়া রহিলেন। নায়েব গোমস্তারা বলিল—এই লোকের ঐ ধারাই বটে। বেটা সেখানে কিছু টাকা খেয়ে পঁয়তাড়া করেছে আর কি!

হেমাঙ্গবাবু সেদিন সমস্ত দিন কুকুর দুইটার পরিচর্য্যায় মত্ত হইয়া রহিলেন।

* * *

বৎসর খানেক পর হেমাঙ্গবাবু তাঁহার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে গেলেন হুগলী জেলার একখানা গ্রামে। বন্ধুও তাঁহার অবস্থাপন্ন জমিদার। সেইখানে সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাঁহার রতনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—এবার আমি এক বাঘ পুষেছি, দেখবে?

হেমাঙ্গ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বাঘ?

—হ্যাঁ বাঘ। যাকে বলে শেলেদা বাঘ।

—চল, দেখি, কোথায়? হেমাঙ্গবাবু উৎসুক হইয়া উঠিলে বন্ধু বলিলেন, বসো না। এইখানে আনছে। ওরে তারাচরণকে ডেকে দে তো। হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—বাঘ এখানে আনবে কি হে? না না—এ সাহস ভাল নয়। এখনও বাচ্চা বুঝি?

—বাচ্চা নয়, বরং প্রৌঢ়।

—বল কি? হেমাঙ্গবাবুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—সেলাম হুজুর!

আভূমি নত সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াই রতন হেমাঙ্গবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবুরও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বন্ধুটি রসিকতা করিয়া বলিলেন—নরব্যাঘ্র। শিকার দেখিয়ে শেকল খুলে দিলে তার আর নিস্তার নাই।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হুঁ।

এই সময় একজন কর্ম্মচারী আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর বন্ধুকে কি বলিতেই তিনি উঠিয়া বলিলেন—তুমি আলাপ কর এর সঙ্গে, আমি আসছি।

রতন হেমাঙ্গবাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিল—তুই পালিয়ে এলি কেন?

রতন বলিল—আমি যে পারলাম না হুজুর কাজ করতে।

—কেন?

কখনও যে আমি ও কাজ করিনি। আমি যে সব মিথ্যে ক'রে বলতাম। যেখানে যে খুন দাঙ্গা হ'ত, সব আমি নিজের নাম দিয়ে মিথ্যে ক'রে বলতাম। হেমাঙ্গবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কেন এমন করতিস? কে তোকে এ বিদ্যে শেখালে?

রতন শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তারপর মাথা হেঁট করিয়া অনাবশ্যক ভাবে মাটিতে দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল, হুজুর, দশ বছর আগে, তখন আমার একটি মাত্র ছেলে। সেবার দেশে আকাড়া হ'ল এমন যে, না খেয়ে মানুষ মরতে লাগল। পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে আপনার সঙ্গে যেখানে প্রথম দেখা হয় ঐ চাকলায় আসি। এ চাকলায় ধানটান চারটি হয়েছিল, আমার সেই উপোষ সার! শরীরে বল ছিলনা, খাটতে পারতাম না, ভিক্ষেও কেউ দিত না। তার উপর ছেলেটার হ'ল অসুখ। কোন কিছু ক'রেও কিছু যোগাড় করতে পারলাম না। এক জমিদারের বাড়ী গেলাম—সেখানেও

ভিক্ষে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। পথে আসতে আসতে আবার ফিরলাম। জমিদারকে গিয়ে বললাম, ভিক্ষে দেন—না হয় কাজ দেন। জমিদার বাবু বললেন, কি কাজ পারিস তুই ? মরিয়া হয়ে বল্‌লাম—যা বলবেন, খুন, জখম, ঘরে আগুন লাগান—যা বলবেন, তাই করব। আশ্চর্য্য বাবু, জমিদারবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা টাকা বকশিশ দিয়ে দিলেন। ছেলেটা মরে গেল সেই অসুখেই, আমি কিন্তু ফন্দিটা শিখে নিলাম। যেখানে যা খুন জখম হ'ত বলতাম আমি করেছি। লোকে ভয় করত, যার দোরে দাঁড়াতাম সেই আঁচলটা ভ'রে দিত, খাতিরও করত।

রতন চুপ করিল।

হেমাঙ্গবাবুও নীরব। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—চল, তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল। তোকে কিছু করতে হবে না।

রতন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আরজন্মে আপনি আমার সত্যিই বাপ ছিলেন হুজুর।

* * *

আশ্চর্য্য! পরদিন প্রাতেই কিন্তু দেখা গেল রতন স্ত্রীকে লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।

এবার আর হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইলেন না। তিনি কল্পনানেত্রে দেখিলেন —আবার কোন দূরদেশে রতন আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া কোন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতেছে—সেলাম হুজুর!

চৌকিদার

ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাথায় বাবরী চুল, মুখে চোখে বেশ একটি নম্র ভাব, হাত ও বুকের পেশীগুলি বেশ সুপুষ্ট, প্রত্যেকটি পেশী দৃঢ় মোটা দড়ির মত চামড়ার অন্তরালে সুস্পষ্ট দেখা যায়; প্রেসিডেণ্ট-বাবুর লোকটাকে বেশ পছন্দ হইল। তিনি তবুও প্রশ্ন করিলেন, কি নাম বললি তোর?

হাতজোড় করিয়া বনোয়ারী বলিল, আজ্ঞে, ব্যানো।

—ব্যানো? ব্যানো কি? ব্যানো কি মানুষের নাম হয়?

—আজ্ঞে হুজুর, বনোয়ারী বাগ্দী! বনোয়ারী আপন অজ্ঞতায় অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

প্রেসিডেণ্ট-বাবু বলিলেন—দেখ তুই পারবি তো? লোকজনের বাড়ী ঘর জীবন সুদ্ধ পাহারার ভার তোর হাতে।

কথাটায় বনোয়ারী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল; বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। কেমন একটা ভয় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বনোয়ারী জোড়হাতে প্রেসিডেণ্ট-বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি তাহার কেমন বিহ্বল, একটা শঙ্কিত ছায়া যেন সেখানে ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট-বাবু আবার বলিলেন—দেখ, পারবি তো?

উত্তর দিল নোটন চৌকিদার, তা পারবে বৈ কি বাবু, ভর্ত্তি জোয়ান মরদ, বাগ্দীর ছেলে পারবে না আবার কেনে?

মাখন চৌকিদার সায় দিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ছাড়া ব্যানোর আমাদের, ক্ষ্যামতাও বেশ, লাঠিও ধরতে পারে, কাজ উ আজ্ঞে ভাল করবে।

প্রেসিডেণ্ট-বাবু আর প্রশ্ন করিলেন না, নীল রঙের কোর্ত্তা, নীল রঙের পাগড়ি, ঝুলি ও পিতলের তকমা-আঁটা চামড়ার পেটি বনোয়ারীকে দিয়া তাহার হাতের টিপ লইয়া তাহাকে চিতুরা গ্রামের চৌকিদার নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

তারপর বলিলেন—থানায় হাজরে দিতে হবে তোকে সপ্তাহে দু-দিন, এখানে ইউনিয়ন বোর্ডে দু-দিন, বুঝলি? আর রাত্রে গাঁয়ে রোঁদ দিতে হবে

রোজ দু-বার ক'রে। ঠিক বারোটা সাড়ে বারোটার সময় একবার, আর একবার ভোরবেলায়—এই দুটো সময়েই মানুষের ঘুম চাপে, বুঝলি ?

বনোয়ারী এতক্ষণে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বোর্ড-অফিস হইতে বাহির হইয়া বনোয়ারী নীরবেই চলিয়াছিল। পুরাতন চৌকিদার কয়জন সদ্য-নিযুক্ত বনোয়ারীকে নানা উপদেশ দিয়া উপকৃত করিতে আরম্ভ করিল।

নোটন বলিল—হ্যাঁ, দু-বার ক'রে রোঁদ দিবি। ক্ষেপেছিস যেমন তুই—ওই শোবার আগে একবার হুইহাই ক'রে হাঁক দিয়ে ঘরে এসে শুবি।

মাখন সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন লোক, সে বলিল—এই দেখ, থানার কাজটি ভাল ক'রে করবি, দারোগা-বাবুর মন জুগিয়ে চলবি, ব্যস্—কোনও মামু কিছু করতে লারবে। আর তোর সায়েব-সুবো এলে খাড়া হাজির থাকবি। চাকরি তোর মারে কে ?

নোটন বলিল—বোর্ডের কেরানি-বাবু বলে, মাখন ঘরে শুয়ে জান্‌লা থেকে হাঁক দেয় !—বলিয়া সে হি হি করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

মাখন এবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—আর আগেকার পেসিডেন-বাবু যে বলত, নোটা হাঁক দিতে বেরোয় আর নোটার পরিবার নোটার পেছু পেছু যায় নোটাকে সাহস দিতে। সে মিছে কথা নাকি ? উ করার চেয়ে জানালা থেকে হাঁক মারা ভাল।

নোটন কিন্তু রাগ করিল না, সে হাসিতে হাসিতে বলিল—তাও কি না দিতাম রে ! দিতাম। একদিন জমাদার-বাবুর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। সেই হ'তে তো জমাদার-বাবু নাম দিয়ে দিলে "পুরানো-পাপী !" আমরা হলাম পুরনো পাপী।—বলিয়া সে আবার প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। মাখনও সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না।

বেহারী ডোম নোটন ও মাখনের অপেক্ষা অল্পবয়সী, সে এবার বলিল—আমাদের ভীম কি কম নাকি, উ বাবা সবারই উপর টেক্কা দেয়। সেবার

পেসিডেন্‌-বাবুর বাগান খুঁড়তে খুঁড়তে তলে তলে তিনটে গাছের শেকড় কেটে সেরে দিয়েছিল। বলবি, আর বাগান খুঁড়তে বলবি?

আর একবার বর্দ্ধিত কৌতুকে হাসির উচ্ছ্বাসে জোয়ার ধরিয়া গেল! হাসির কলরোলের মধ্যেই গ্রামখানা পার হইয়া সকলে গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার সব দল ভাঙিয়া আপন আপন গ্রামের পথ ধরিবে।

মাখন বলিল—লেগে তো গেলি মা কালী ব'লে! মাকে পূজো দিস পাঁচ আনা! আর আমাদিগকে এক হাঁড়ি মদ।

বনোয়ারী এইবার বলিল, সে আমি নিশ্চয় দোব! মাইনে যেদিন পাব সেই দিনই দোব!

নোটন বলিল—হ্যাঁ, এই দেখ, সেক্রেটারী-বাবু বলবে, আমাকে কিছু দে। তুই 'দোব না' বলিস না, মুখে বলবি দোব, কিন্তু ফি মাসেই বলবি, আসছে-মাসে দোব। বুঝলি! আর আজ বিকেলেই থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে সেলাম দিয়ে আসবি। ডিম-টিম গণ্ডা দুই নিয়ে যাস বরং।

মাখন খুব গম্ভীরভাবে বলিল—আর একটি কথা শিখিয়ে দিই,—এই দারোগা-বাবুর কাছে গিয়ে পেসিডেন-বাবুর নিন্দে করবি, আর পেসিডেন-বাবুর কাছে দারোগা-বাবুর নিন্দে করবি। একে বলবি—উ ভারী বদলোক মশাই! ওকে বলবি—উ ভারী বদলোক হুজুর! ব্যস, দু'জনাই তোকে ভালবাসবে।

বনোয়ারী একাই এবার মাঠের আল-পথ ধরিয়া আপন গ্রামের দিকে চলিল। মনটা তাহার আজ কেমন হইয়া গেছে। মাসিক সাত টাকা বেতন, তবুও আনন্দটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে না।

রাত্রির অন্ধকারে চোর-ডাকাত কে কোথায় লুকাইয়া থাকিবে কে জানে? চোর-ডাকাতকেও পার আছে, তাহারা নিজেই হয়তো সম্মুখে আসিবে না, কিন্তু সাপ? হেঁড়োল—সেই নেকড়ে বাঘগুলা? ভাবিতে ভাবিতে বনোয়ারী আপন হাতের লাঠিটা সজোরে ধরিয়া শূন্যে আস্ফালন করিয়া আপন মনেই

বলিয়া উঠিল, এক লাঠি বসাতে পেলে তো হয়! তাহার মনের শঙ্কিত অবসাদ যেন অনেকটা কাটিয়া গেল।

গ্রামে ঢুকিবার আগেই সে নূতন কোর্ত্তাটা গায়ে দিল, পাগড়িটা মাথায় বাঁধিল, তারপর কোমরে পেটা আঁটিয়া পদক্ষেপের মধ্যে বেশ একটু গুরুত্ব ফুটাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। কোন প্রয়োজন ছিল না, এদিকে জলখাবার বেলাও গড়াইয়া গেছে, তবুও সে সমস্ত গ্রামটা একবার ঘুরিয়া তবে বাড়ী ফিরিল। তাহার স্ত্রী কমলি তখন বাহিরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রান্না করিতেছিল। বনোয়ারীর মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল—সেও কমলির দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল, ব্যানো কোথায় গিয়েছে?

কমলি চকিত হইয়া ঘুরিয়া বক্তার দিকে চাহিল, তারপর আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে বলিল, দারোগা-বাবু না পেসিডেন-বাবুর বাড়ী গিয়েছে!

বনোয়ারী বলিল, দারোগা-বাবু হুকুম দিয়েছে, ঘর খানাতল্লাস করব আমি! দেখব চোরাই মাল-টাল আছে না কি?

কমলি এবার চমকিয়া উঠিল, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে লোকটার দিকে সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া পারিল না। পরক্ষণেই সে দাওয়ার উপর হইতে উঠানে একরূপ ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বনোয়ারীকে পিছন হইতে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আগে চোরকে দড়ি দিয়ে বাঁধি; দাঁড়াও!

বনোয়ারী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলি বলিল, হাসলে হবে না, কই নাও, ছাড়াও দেখি, দেখি কেমন চৌকিদার!

বনোয়ারী বলিল, ছাড়—ছাড়। হার মানছি আমি, ছাড়।

কমলি তবু ছাড়িল না, বলিল, না, তা বললে শুনব না, ছাড়াতে হবে। বনোয়ারী এবার শক্তি প্রয়োগ করিল, কিন্তু কমলির হাত দু'খানা যেন লোহার শিকলের মত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! সে প্রাণপণে শক্তি প্রয়োগ করিয়া একটা ঝটকা মারিল। সঙ্গে সঙ্গে এবার কমলির হাতের বাঁধন খুলিয়া গেল,

কমলি ছিটকাইয়া গিয়া উঠানের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। বনোয়ারী অপ্রতিভ এবং শঙ্কিত হইয়া ডাকিল, কমলি, কমলি!

কমলি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, না বাপু, পারবে চৌকিদারী করতে।

তারপর আবার বলিল, পোষাক প'রে তোমাকে বেশ লাগছে কিন্তুক!

* * *

থানার দারোগা-বাবু পাকা লোক, অ্যাসিষ্টাণ্ট সাবইনস্পেক্টারিতে পনের বৎসর কাটাইয়া এখন অস্থায়ী ভাবে সাবইনস্পেক্টার হইয়াছেন—ভড়কালো গোঁফ জোড়াটায় পাক ধরিয়াছে। তিনি বনোয়ারীর আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, চুরি টুরি করেছিস কখনও?

বনোয়ারীর মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, তবুও সে কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া করযোড়ে বলিল, আজ্ঞে না, হুজুর!

দারোগা-বাবু ব্যঙ্গভরে বলিলেন, না হুজুর! তা হ'লে তুই চোর ধরবি কি ক'রে?

বনোয়ারী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এ কথার উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না।

দারোগা-বাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, তো বেটার বিয়ে হয়েছে?

সলজ্জভাবে বনোয়ারী উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হুঁ! পরিবারকে ভালবাসিস কেমন?

এবার লজ্জায় বনোয়ারীর মাথাটা হেঁট হইয়া পড়িল, সে বিনা কারণে পায়ের বুড়ো আঙুলটায় মোচড় দিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা-বাবু অত্যন্ত কর্কশস্বরে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, বলি, পরিবারকে একা ফেলে হাঁক দিতে বেরুবে, না ঘরে ব'সেই হাঁক মেরে মাইনে নেবে?

বনোয়ারী হাতজোড় করিয়া আবার বলিল, আজ্ঞে না।

—দেখিস!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হ্যাঁ। নইলে কিন্তু পিঠের চামড়া তুলে দোব তোমার। গারদ-ঘর দেখেছিস? গারদে পুরব বেটাকে!

এ কথার কোন জবাব বনোয়ারী দিল না, কাজ সে ভাল করিয়াই করিবে। প্রেসিডেণ্ট-বাবুর কথা এখনও যেন তাহার কানের কাছে বাজিতেছে—"লোকজনের জীবন সুদ্ধ পাহারার ভার তোর হাতে।"

দারোগা-বাবু বলিলেন, প্রেসিডেণ্ট-বাবুকে ক-টাকা দিলি চাকরির জন্যে?

বনোয়ারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সে হাত জোড় করিয়া অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে না! তিনি হুজুর—

সঙ্গে সঙ্গে মাখনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—"দারোগা-বাবুর কাছে পেসিডেন-বাবুর নিন্দে করবি।" বক্তব্যটুকু আর শেষ করিতে তাহার সাহস হইল না।

—তবে কি? একটা পাঁঠা না কি?

—আজ্ঞে না!

—যাঃ বেটা, মিথ্যাবাদী! এই দেখ, ওসব করলে চলবে না বাবা, চাকর তুমি থানার। পেসিডেণ্ট-ফেসিডেণ্ট ভুয়ো, আজ আছে কাল নাই। তারপর অকস্মাৎ কঠোর স্বরে বলিলেন, আগে থানার কাজ, বুঝলি?

বনোয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে-কথা সে বুঝিয়াছে। দারোগা-বাবু বলিলেন, হ্যাঁ। যা, ছোটবাবুর কাছে গাঁয়ের দাগীদের নাম জেনে নে গিয়ে। আর রাত্রে, মানে লোকজন সব শোবার পর রাস্তায় যাকে দেখবি—তার নাম ধাম সকালে থানাতে জানাবি।

—আজ্ঞে দাগীদের?

—ওরে বেটা, না। দাগীরা তো রাত্রে বেরুতেই পারে না। এ যে-কেউ লোক—ভদ্রলোক ছোটলোক সব।

* * *

জন্ম-মৃত্যুর হিসাবের খাতা, রোঁদ-দেওয়ার সার্টিফিকেট বই এবং দাগীদের নাম জানিয়া লইয়া বনোয়ারী বাড়ী ফিরিল! কমলি আজ ঘটা করিয়া সাজ-সজ্জা করিয়া বসিয়া আছে, বেশ যত্ন করিয়া সে চুল বাঁধিয়াছে, কালো কপালে রাঙা ডগডগে সিন্দুরের টিপ, তাহার উপর গাঢ় হলুদ রঙের একখানা নূতন রঙীন শাড়ী পরিয়া একখানা বস্তা পাতিয়া জাঁকজমক করিয়া বসিয়া আছে। বনোয়ারীকে দেখিয়াই সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বনোয়ারীর এটুকু বড় ভাল লাগিল, সে রসিকতা করিয়া বলিল, ওরে বাবাঃ! চোখে যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না গো!

কমলি এতটা বুঝিতে পারিল না, সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া কাছে আসিয়া বলিল, কি হ'ল? চোখে কুটো পড়ল বুঝি?

বনোয়ারী অভিনয় করিয়াই আবার বলিল, না—না—ছটা ছটা!

—ছটা? ছটা কি গো? ছটা কোথা পেলে?

বনোয়ারী এবার তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিল, তোর রূপের ছটা গো—তোর রূপের ছটাতে চোখ আমার ঝলসে গেল।

আশ্চর্য্য! কমলি কিন্তু ইহাতেও রাগ করিল না—সে দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তা আমি কি 'যেনা-তেনা' লোক না কি? চাকরি হ'ল তোমার, আমি সাজ করব না। ইয়েরই মধ্যে পাড়ার লোকে বলছে—থানদারের বৌ!

পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বনোয়ারী বলিল, বলছে?

হ্যাঁ, দু-তিন জনা ব'লে গেল। নতুন কাপড় বেচতে এসেছিল, টাকা ছিল না—তা বাউড়ীদিদি নিজে থেকে টাকা ধার দিলে। হুঁ হুঁ, তোমার চেয়ে আমার খাতির বেশী।

বনোয়ারী চকিত হইয়া উঠিল, বলিল, টাকা ধার করলি?

কমলি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, ওঃ, মোটে তো ড্যারটি টাকা ধার—তা সে তোমাকে লাগবে না বাপু!

বনোয়ারী বলিল, না, না—

কমলি কথা কাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আর 'না-না'য়ে কাজ নাই তোমার। লোকে বললে—থানদারের বৌ হয়েছিস—তুই একখানা কাপড় নিবি না! তখন না নিলে আমার মানটি কোথা থাকত?

বনোয়ারী এবার বলিল, তা বেশ করেছিস। কাপড়টিতে কিন্তুক মানিয়েছে তোকে বড় ভাল। আসছে মাসে আর একখানা কিনে দোব!

কমলি পরিতুষ্ট হইয়া বলিল, এবার কিন্তু লাল রঙের!

—তা বেশ। এখন রান্না চাপিয়ে দে দেখি সকাল ক'রে। সন্ঝেতে খেয়ে নিয়েই এক ঘুম দিয়ে নোব। ঠিক দোপরের সময় উঠতে হবে হাঁক দিতে।...তুই একা থাকতে পারবি তো ঘরে? ভয় লাগবে না?

কমলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তোমার রোঁদ দিতে বেরুতে ভয় লাগে তো আমি তোমাকে দাঁড়িয়ে আসব চল। ঘর তো ঘর, আমি ব'লে তিনখানা গাঁ পার হ'য়ে চ'লে যাই।

সে আজ কয় বৎসরের কথা—কমলি প্রথম শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া একদিন রাত্রে উঠিয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছিল। কমলি তখন এগার বছরের মেয়ে।

কথাটা মনে পড়িয়া বনোয়ারীও হাসিল, হাসিয়া বলিল, তা বটে, তা তুমি পার।

কমলি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, তা আর পারি না বাপু। কেমন ক'রে যে গিয়েছিলাম, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার।

* * *

মাঝ-উঠানে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বনোয়ারী বলিল, হ্যাঁ, রাত দোপর হয়েছে; আকাশে হুই দেখ—মুনি ঋষি তারাগুলা কোথা গিয়েছে।

কমলি বলিল, রাতের সনসনানি দেখেছ?

বনোয়ারী হাসিয়া বলিল, না, উটো তোর বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

কমলি বলিল, যাঃ, বাতাসে বুঝি গাছের পাতা নড়ে? রেতে গাছেরা

জীবন পায় কি না—উ ওরা কথা কয়। গাছে পাতা নড়ে, তাতেই বাতাস দেয়।

কথাটা বনোয়ারীর মনে ধরিল, কিন্তু তাহা লইয়া কথা বলিবার অবসর ছিল না! তাহাকে রেঁাদে বাহির হইতে হইবে। ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকিয়া সে বলিল, লে—দুয়োর দে ভাল ক'রে—আমি এসে দু-তিন ডাক দোব—তবে দুয়োর খুলে দিবি। আচমকা এক ডাকেই যেন উঠে দুয়োর খুলিস না।

কমলি মৃদুস্বরে বলিল, এই দেখ, সাবধানে পথ দেখে চ'ল বাপু!

অল্পখানিকটা পথ চলতেই বনোয়ারীর চোখের সম্মুখে অন্ধকার যেন ঈষৎ হাসিয়া উঠিল—পথঘাট বাড়ীঘর সবই চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, পথের সাদা ধূলা, পাশের জমির ঘাসগুলি পর্য্যন্ত। দুই পাশের বাড়ীগুলি নিস্তব্ধ, সব বন্ধ—নিঝুম পুরীর মত বাড়ীগুলার দিকে চাহিয়া শরীর যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠে! গাছগুলার পাতা-নড়া দেখিয়া মনে তবু সাহস জাগে। কমলি মিথ্যা বলে নাই—রাত্রে গাছে জীবন পায়। কোন মুনির শাপে ওরা আর কথা কহিতে পারে না, নতুবা আগে গাছেরা কথা কহিত, এখান হইতে ওখানে উড়িয়া চলিয়া যাইত, উহাদের নাকি পাখা—কে? ও কে? ভটচাজদের প'ড়ো বাড়ীটার জঙ্গলের মধ্যে সাদা রঙের ওটা কি?

বনোয়ারীর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল—না, ওটা কারও গরু, রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে।

সে আশ্বস্ত হইয়া একটা হাঁক মারিল, এ, হৈ!—এ—!

রাত্রির অন্ধকারে কত যে উপদ্রব, শুধু কি মানুষ! ভূত-প্রেত ডাকিনী-যোগিনী কত যে—! বনোয়ারী গ্রামের মাথার উপর দৃষ্টি তুলিয়া খুঁজিতেছিল—কোথায় বাড়ীর পুকুর পাড়ের উপর শিমূলগাছটা!

কি? কে?

পাশেই কিসের একটা শব্দ শুনিয়া নীচে দৃষ্টি নামাইয়া শিহরিয়া উঠিয়া বনোয়ারী দশ পা হটিয়া আসিল। অন্ধকারের মধ্যে ঘাসের উপর দিয়া সাদা

মোটা দড়ির মত একটা কি চলিয়াছে। সাপ—'জাত' নিশ্চয়, এতটা মোটা গোখরো ছাড়া তো অন্য সাপ হয় না। বনোয়ারী লাঠিটা বাগাইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু সাপটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বনোয়ারী সন্তর্পণে স্থানটা পার হইতে হইতে বলিল, যা বাবা, চলে যা। তোকে আমি কিছু বলি নাই—তুই যেন কিছু বলিস না।

রায়দের বাড়ীর কাছে আসিয়া পথের বাঁক ফিরিয়াই আবার বনোয়ারীকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। একটি শ্বেতবস্ত্রাবৃতা স্ত্রী-মূর্ত্তি ওর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বনোয়ারী প্রশ্ন করিল, কে? কে গো আপুনি?

স্ত্রী-মূর্ত্তি মাথার অবগুণ্ঠন আরও বাড়াইয়া দিয়া নীরবে আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইল, যেন বনোয়ারীকে চলিয়া যাইতেই নির্দ্দেশ দিল।

বনোয়ারী দ্বিধায় পড়িল; ভদ্রঘরের মেয়ে নিশ্চয়; কিন্তু দারোগা-বাবু যে বলিয়াছিলেন—যে কেউ হউক; রাত্রে পথে দেখিলেই তাহার পরিচয় জানিতেই হইবে! সে আবার প্রশ্ন করিল, কে গো আপুনি?

এবার মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, আমি বাবা রায়েদের। ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম—ছেলের ওসুখ।

বনোয়ারী সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। ওই অসহায় বিধবাটির জন্য করুণার আর সীমা রহিল না। এইবার সে চিনিয়াছে—মেয়েটি কে! দুইটি শিশু-সন্তান লইয়া অসহায়া বিধবাটির দুঃখের আর সীমা নাই।

এইবার এই পাড়াটা পার হইয়াই হাড়ীপাড়া। ওই পাড়াতেই তিন জন দাগী আছে। আঃ, এই কুকুরগুলাই বড় জ্বালাতন করে। চোর কি চৌকিদার উহারা চিনিতে পারে না, মানুষ দেখিলেই বেটারা চীৎকার করিবে। কয়টা কুকুর চীৎকার করিতে করিতে বনোয়ারীর পিছন ধরিয়াছে। পাড়ার সীমা শেষ করিয়া বনোয়ারী আরও খানিকটা অগ্রসর হইলে তবে তাহারা ফিরিল।

আর চীৎকার করিতেছে ঝিঁঝিঁপোকাগুলো, উহাদের চীৎকারের আর বিরাম নাই! বনোয়ারী হাড়ীপাড়ার নিশি হাড়ীর দুয়ারে হাঁকিল, নিশি—নিশি!

ঘরের ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর দিল, কে গা?

—আমি চৌকিদার—ব্যানো বাগ্দী। নিশি কই?

—অ, তুমি বুঝি নতুন থানদার হইছ; আহা, তা বেশ।

বনোয়ারী একটু খুশী হইল, হাসিমুখেই বলিল, তা নিশি কই! ডেকে দাও নিশিকে।

—আ বাপু, এমন জ্বর আইচে, ব্যাভোল হয়ে প'ড়ে আছে মানুষ। তা ডাকি।...বলি ওগো, শুনছ! ওঠ একবার, ওই দেখ থানদার ডাকছে।

কিন্তু সাঁড়া পাওয়া গেল না। নিশির স্ত্রী হতাশ হইয়া বলিল, না বাপু, এ কি করব আমি বল দেখি, মানুষের 'হাঁ'ও 'না'ও নাই। গায়ে ধান দিলে খৈ হচ্ছে জ্বরে। হ্যাঁ গো থানদার, তুমি বাপু ওষুদ-টষুদ কিছু জান?

বনোয়ারীর মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। হতভাগিনী মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নিশি সারাজীবন উহাকে দুঃখই দিল! এক একবার নিশি জেলে যায়, মেয়েটা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। আবার এই রাত্রে ওই হতভাগার শিয়রে জাগিয়া বসিয়া আছে।

বনোয়ারী ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস কর, করলেই হুঁস হবে।

বনোয়ারী ওই মেয়েটার কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

আবার শেষ রাত্রে রোঁদে বাহির হইয়া সে ডাকিল, বলি হাড়ী-বৌ, নিশি কেমন রয়েছে?

নিশির তখন বোধ হয় চেতনা হইয়াছে, কারণ হাড়ী-বৌয়ের বদলে সেই ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, না, এখনও ছাড়ে নাই, তবে কমেছে খানিক।

বনোয়ারী বলিল, কাল ডাক্তার দেখাস নিশি।

নিশি জবাব দিল, তুমি বুঝি নতুন থানদার হ'লে? তা বেশ! তা তামুক খাবে—আগুন করব?

—না না। তোর জ্বর—থাকুক তামাক।

নিশি বলিল, তা হ'ক, করি কষ্ট ক'রে। আমারও ভারী মনে হচ্ছে খেতে।

নিশি গায়ে কাপড়চোপড় দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিল।

নিশি লোক বড় ভাল—প্রাণখোলা লোক, এমন লোক যে কেমন করিয়া চোর হইল, কে জানে!

পরদিন বেলা দশটার সময় একজন কনেষ্টবল আসিয়া হাজির হইল। বনোয়ারীকে ডাকিয়া লইয়া বলিল, চল, নিশিকে পাকড়ানে হোগা। থানামে তলব আছে। দেবীপুরে চুরি হইয়েছে।

নিশি বলিল, আজ্ঞে, মশায় সারারাত কাল আমার বেধড়ক জ্বর, বিশ্বেস না হয়, শুধোন থানদারকে!

কনষ্টেবল হাসিয়া বলিল, হাঁ হাঁ, উ বাৎ দরোগা-বাবুকো পাশ বোল না। ডাগদার-লোক হ্যায়, উনি বেমার দেখেগা, দাওয়াই ভি বাতলায়ে গা। চল।

নিশির স্ত্রী তার পরে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল।

নিশি দারোগা-বাবুকেও সেই এক কথাই বলিল, কাল সারারাত জ্বরে আমার চেতন ছিল না হুজুর, শুধোন আপনার থানদারকে।

বনোয়ারীর অন্তর করুণায় আলোড়িত হইতেছিল, তাহার হৃদয়ের সত্য নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া নির্দ্দোষকে লাঞ্ছনা হইতে ত্রাণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। নিশির কথা শেষ হইবামাত্রই সে আপনা হইতেই কর-জোড়ে বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।

দারোগা-বাবু অকস্মাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, ওরে শূয়ারকি বাচ্চা, প্রত্যক্ষওয়ালা,—তোকে কে জিজ্ঞাসা করেছে শুনি? কে তোকে কথা বলতে বলেছে?

সত্যভাষণের প্রত্যুত্তরে এমন দুর্দ্দান্ত রোষ বনোয়ারীর কল্পনাতীত। সে আতঙ্কে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে দারোগা-বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দারোগা-বাবু আবার কৈফিয়ৎ দাবী করিলেন, এ্যাও শূয়ারকি বাচ্চা, কে তোকে কথা বলতে বলেছে?

বিহ্বল ভাবেই বনোয়ারী বলিল, আজ্ঞে—

মাখন চৌকীদার আসিয়া তাহাকে ত্রাণ করিল। সে তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, ভাগ বেটা বেকুব কোথাকার? বড়লোকের কথার মাঝখানে তুই কথা বলিস কেনে? আবাঙ আনাড়ী, চল, এখান থেকে স'রে চল!

সরিয়া আসিয়া বনোয়ারী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কিন্তু তাহার বুকের অস্বাভাবিক কম্পন তখনও শান্ত হয় নাই। মাখন বলিল, বেকুব কোথাকার, অমন ক'রে কথা কয়? এ হ'ল পুলিশের চাকরি; কানে শুনবি, চোখে দেখবি, কিন্তুক মুখে ফুকুরবি না। পেটকে করতে হবে লোহার সিন্দুক।

বনোয়ারী এবার অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, আমি কাল নিজে দেখেছিলাম কিনা!

বাধা দিয়া মাখন বলিল, চোখে তো দেখছিস—ওই পথ দিয়ে কত লোক চলছে। কে চোর কে সাধু চিনতে পারিস? মানুষের পেট যেমন ময়লায় ভর্ত্তি, মনেও তেমনি সবাই বাবা হুঁ-হুঁ, ও তোর নিশিকে দোষ দোব কি!—সবাই চোর। কার মনে পাপ নাই বল? রোঁদ দিতে দিতে আমার মন তো ভাই হাঁকপাক করে, আমরা নিলে তো আর।—সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

বনোয়ারী শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বনোয়ারী তিরস্কৃত হইল সত্য, কিন্তু দারোগা-বাবু তাহার কথা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, নিশিকে খানিকটা লাঞ্ছনা দিয়াই ছাড়িয়া দিলেন।

নিশি ও বনোয়ারী একসঙ্গেই বাড়ী ফিরিতেছিল, থানার গ্রাম পার হইয়াই নিশি হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, অঃ খুব এড়াইছি বাবা; কানের পাশ দিয়ে তীর ডেকে গেল। তুই না বললে নি-য়ে-ছি-ল আমাকে। বলিয়াই সে কোঁচড় হইতে বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া বলিল, লে, বিড়ি খা। আর সন্ঝে বেলাতে যাস, মদ খাওয়াব তোকে।

অত্যন্ত রূঢ় স্বরে বনোয়ারী বলিল, না।

নিশি নিজে বিড়িটা ধরাইয়া বলিল, তা বেশ, নোক-জানাজানি হবে। তার চেয়ে তোকে একটা টাকা দোব আমি। হিত করলে আমরাও ভুলি না রে!

বনোয়ারী এবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তা হ'লে কাল তোর জ্বরের কথা মিছে? বৌ তোর মিছে কথা বলেছে আমাকে?

নিশি হি-হি করিয়া হাসিয়া গেল, তারপর বলিল, যা, তাই ব'লে আয় দারোগা-বাবুকে, বকশিশ পাবা মোটা।

বনোয়ারী চুপ করিয়া গেল। নিশি পরম পুলকে বেতাল বেসুরে গান ধরিয়া দিল—'যমুনাকে যাব কি সই ননদিনী পাহারা।'

বনোয়ারী মনের মধ্যে গুমরাইতে গুমরাইতে বাড়ী ফিরিল। কমলি তাহার মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, অঃ থানদার থানদার লাগছে বাপু—মুখ দেখেই ভয় লাগছে।

বনোয়ারী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, হুঁ।

এবার শঙ্কিত হইয়া কমলি বলিল, কি, হইছে কি গো?

বনোয়ারী বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

কমলি বলিল, সর—আমি সেজে দি।

বনোয়ারী বলিল, না।

*　　*　　*　　*

অন্ধকার রাত্রে আমবাগানের ঘনপল্লবতলের গাঢ়তর অন্ধকারে নিঃশব্দে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—থানার জমাদার-বাবু, দফাদার ও

বনোয়ারী। অল্প দূরেই নিশি হাড়ীর বাড়ী। কথাবার্ত্তা তেমন স্পষ্ট শোনা যায় না, কিন্তু বাড়ীর হাবভাব অনেকটা বুঝা যায়। নিশির বাড়ীতে বেশ একটি গোপন সমারোহ চলিতেছে। মাছভাজার গন্ধে বনোয়ারীর জিভটা যেন সরস হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দমকা এক এক ঝলক মদের গন্ধও ভাসিয়া আসিতেছে। কখনও কখনও অস্ফুট গুঞ্জন স্পষ্ট হাস্যরোলে ফাটিয়া পড়িতেছে। উনানের আলোয় বনোয়ারী বেশ দেখিতেছে নিশির স্ত্রীর পরনের নূতন রঙীন শাড়ি।

জমাদার-বাবু অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখলি বেটা হাঁদারাম বাগ্দী।

বনোয়ারী নতশিরে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। জমাদার-বাবু বলিলেন, আয় এখন। এ গাঁ সেরে আবার আমাকে দেবীপুর যেতে হবে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি আবার বলিলেন, এ রাতে আর নিশিকে ডাকবি না আজ—শেষ রাতে ডাকবি। যেন জানতে না পারে এসব আমরা দেখেছি। দিন দশেক পর বেটার ঘর খানাতল্লাস করব। বেটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে মাল ঘরে আনুক।

আজ ঠিক মধ্যরাত্রি নয়, মধ্যরাত্রি হইতে খানিকটা বিলম্ব আছে। আজ সাপটার সঙ্গে দেখা হইল নির্দিষ্ট স্থানটার খানিকটা আগেই। সে ওই স্থান অভিমুখে চলিয়াছে। বনোয়ারী থমকিয়া দাঁড়াইল, পিছনে জমাদার-বাবুও দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি?

—সাপ।

হাতের টর্চ্চ জ্বালিয়া জমাদার শিহরিয়া বলিলেন, আরে বাপ! ভীষণ গোখরো।

—মার মার।

বনোয়ারী ইতস্তত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, রোজই দেখা হয় আমার সঙ্গে, কিছু বলে না।

—কিছু বলে না! সাপকে বিশ্বাস আছে? মার মার! দফাদার ততক্ষণে একলাঠি বসাইয়া দিয়াছে। সাপটা ভীষণ গর্জ্জনে মাথা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবার বনোয়ারীও আর দ্বিধা করিল না; উপর্য্যুপরি কয়েকবার ক্ষিপ্র কঠিন আঘাত করিয়া সাপটাকে তাহারা শেষ করিয়া দিল। পাশের প'ড়ো জমিতে সাপটাকে ফেলিয়া দিয়া আবার তাহারা অগ্রসর হইল।

জমাদার-বাবু বলিলেন, লাঠিটা ধুয়ে নিবি পুকুর পেলেই।

দফাদার বলিল, ওর বিষ বড় সাংঘাতিক!

—কে? কে? জমাদার-বাবুর হাতের টর্চ্চটার শিখা তীরের মত ছুটিয়া গিয়া একটা বাড়ীর দরজায় আবদ্ধ হইল। বনোয়ারী আপনার লাঠিটার দিকে চাহিয়াছিল—সে পলকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, রায়েদের বাড়ীর দরজা দুই পাটি বন্ধ হইয়া যাইতেছে, তবুও শ্বেতবস্ত্রাবৃতা দীর্ঘ মূর্ত্তির একাংশ যেন সে বেশ দেখিল।

জমাদার-বাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, স্ত্রীলোক।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বনোয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জমাদার প্রশ্ন করিলেন, কার বাড়ী রে?

—আজ্ঞে রায়েদের।

—হু। আচ্ছা, আয়।

তারপর চলিতে চলিতে অল্প হাসিয়া বলিলেন, সংসারে দোষ আর দেব কাকে? চোর-বদমাস সবাই। কেউ ভয়ে চুপ ক'রে থাকে—কেউ অসুবিধেয়। ও তুমি—আমি বাদ কেউ পড়ি না।

বনোয়ারী নতশিরে নীরবেই হাঁটিয়া চলিয়াছিল, জমাদার-বাবুর কথার সূত্র ধরিয়া কথা বলিল দফাদার, এই যে একটা ঠাঁই দেখছেন হুজুর, এই হ'ল বদলোকের এক চিরকেলে আড্ডা।

হাসিয়া জমাদার বলিলেন, অ, এইটাই সে ভুতুড়ে শিমুলতলা বুঝি?

বনোয়ারী মাথা তুলিয়া দেখিল—বাড়ীর পুকুরের পাড়ের উপর প্রকাণ্ড শিমূলগাছটা অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে।

দফাদার বলিল, লাঠিগাছাটা ধুয়ে নিয়ে আয় বনোয়ারী, মাঠের মধ্যে আর পুকুর পাব না আবার।

লাঠি ধুইয়া লইয়া বনোয়ারী এইবার ফিরিল। জমাদার-বাবু ও দফাদার দেবীপুরের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

বনোয়ারীর মনটা কেমন হইয়া গিয়াছে! কেমন উদাস, অথচ কি যেন একটা চিন্তার পীড়নে পীড়িত। অকস্মাৎ সে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল।

আচ্ছা, সে চুরি করিলে কি হয়? কেউ তাহাকে সন্দেহ করিবে না! সঙ্গে সঙ্গে বনোয়ারী শিহরিয়া উঠিল, দ্রুত পদক্ষেপে সে বাড়ীর দিকে একরূপ পলাইয়া আসিল। বাড়ীর অতি নিকটে আসিয়া তবে সে দাঁড়াইল। আঃ!

—কমলি?

কমলি জাগিয়াই ছিল, সে সাড়া দিল, যাই। বাবাঃ ফিরে আসতে পারলে? গিয়েছ সেই কখন!

বনোয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, তা জেগে ব'সে কি করছিস তু?

কমলি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আমার এক ঘুম সারা হ'য়ে গেল, জেগে দেখলাম, তুমি এখনও ফের নাই—সেই কখন গিয়েছ! একা মেয়েনোক আমি, ভয় লাগে না আমার?

এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বনোয়ারী বলিয়া উঠিল, এই দেখ ন্যাকামি করিস না বাপু—হ্যাঁ!

কমলি অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে সে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত পাইয়াছিল, চোখ তাহার ছল ছল করিয়া উঠিল।

বনোয়ারী আপন মনেই গজগজ করিতে লাগিল, বলিল এগারো বছর বয়সে যে মেয়ে তিনখানা গাঁ পার হ'য়ে রেতে রেতে চ'লে যায়, তার আবার ভয় লাগে! হুঁঃ যত সব হুঁঃ!

কমলি অভিমান করিয়া নীরবেই বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর বনোয়ারী বলিল, কাল একবার রায়েদের বউ ঠাকরুণের কাছে যাবি, তো! শুধিয়ে আসবি—এত রেতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল কেনে? বলবি জমাদার-বাবু শুধিয়েছে।

কমলি উত্তর দিল না। বনোয়ারী তিক্তস্বরেই আবার বলিল, শুনছিস?

কমলি মৃদুস্বরে বলিল, হুঁ।

* * * *

অন্ধকার রাত্রি। বনোয়ারী অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরের মত আসিয়া রায়েদের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। দুয়ার বন্ধ—বনোয়ারী বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হ্যাঁ ভিতর হইতেই বন্ধ বটে! তবুও সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পাশের দেওয়ালের গায়ে একরূপ মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। বনোয়ারী একটু হাসিয়া আপন মনেই বলিল, ঠাকরুণ এইবার 'সতর' হইছে!

কমলি উত্তর আনিয়াছিল, কিন্তু সে বনোয়ারীর বিশ্বাস হয় নাই। ছেলের অসুখ না হয় সত্য, কিন্তু ছেলের ঘুম হয় নাই বলিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া ছেলে-ঘুমপাড়ান এ যে চালুনিতে সরিষা রাখার মতই একটা হাস্যকর অজুহাত!

রায়েদের বৌ বলিয়াছিল, মা ছোট ছেলেটির আমার গ্রহণী হয়েছে। রাতে পেটের যাতনা বাড়ে মা, ঘুমোয় না, কাঁদে, কত অনাছিষ্টি বায়না, কাল গরমে বলে—আমি পথের উপর খেলা করব! তাই নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যে খাঁচার মত বাড়ী, পথে এসে কান্নাও থামল, বাতাস পেয়ে ঘুমিয়েও পড়ল।

কথাটা শুনিয়া বনোয়ারী হাসিয়াছিল, সে হাসি এমন অর্থপূর্ণ যে কমলির চোখেও অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সে একটু তিক্তস্বরেই প্রশ্ন করিয়াছিল, হাসছ যে?

—হাসছি ঠাকরুণের কথা শুনে।

—না না, আমি নিজে দেখে এসেছি এই দশা ছেলের, বাঁচে এমন তো আমার মনে লেয় না।

—মরে তো ওই মায়ের পাপেই মরবে।

কমলি শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, এই দেখ, ওকথা ব'ল না। বামুন দেবতা—তার উপর ঠাকরুণের মত নোক হয় না।

অকস্মাৎ মুখ ভ্যাংচাইয়া বনোয়ারী বলিয়াছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বকিস না বাপু,—ঠাকরুণ ভাল, আমিও ভাল, নিশেও ভাল, নিশের বউও ভাল, সংসারে ভাল সবাই।

ধ্বনির উত্তরে প্রতিধ্বনির মতই কমলির মনেও কয়দিন হইতেই বেসুর জমিয়া উঠিতেছিল। এ কথার উত্তরে কমলি যেন অকস্মাৎ জলিয়া উঠিয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিল। বনোয়ারী প্রহার করিতেও ছাড়ে নাই।

কমলি বলিয়াছে, মুখে তোর পোকা পড়বে। ছাই সারকুড়ে ফেলে বলে আঙরা ফেলিস না। ঘরসুদ্ধ জলে যাবে।

কমলি আজ আসিবার সময় উঠে নাই পর্য্যন্ত। ঘরে ও বাহিরের দরজায় তাহাকে শিকল দিয়া আসিতে হইয়াছে। কমলির আগুনের কথাটা মনে করিয়া বনোয়ারী এই অন্ধকারের মধ্যেও তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। সে নিজে তো চৌকিদার, সে যদি চুরি করে, তবে কে তাহাকে সন্দেহ করিবে?

এক জানিতে পারিত ওই গাছগুলা,—সমস্ত রাত্রি উহাদের ঘুম নাই। রাত্রে উহারা জীবন পায়—পাতা নাড়িয়া খস খস বুলিতে কি কথা যে বলে! উহারা সাক্ষ্য দিলে ঠিক কথা জানা যাইত! মনের কথা উহারাই বা কি করিয়া জানিবে?

অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, গুমোট গরমে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে, গাছের পাতা অতি মৃদু ভাবে নড়িতেছে। তালগাছের পাতার শীষগুলি দেখিয়া শুধু বুঝা যায় যে গাছগুলা আজ কথা কহিতেছে, তালগাছের মাথার দিকে চাহিয়া বনোয়ারী একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, উঃ আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া

গেছে! হয়তো ঝড় উঠিবে, বৃষ্টি নামিবে। সে রোঁদ না সারিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

কিন্তু নিশি হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয় আজ এই সুযোগে বাহির হইবে। এমনি রাত্রিই তো চোরের পক্ষে প্রশস্ত। শুধু চোর নয়, অন্ধকার ঘন হইলেই মানুষের মনের পাপ যেন সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহির হইয়া আসে! সে আপনার বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িল।—ও কি? কে একজন গলিপথে দ্রুত চলিয়া যায় নয়? আবছা দেখা যাইতেছে! হুঁ, একটা দারুণ সন্দেহে তাহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল। দ্রুততর গতিতে আপনার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দুয়ারে হাত দিল। এ কি—শিকল কেন? দারুণ উত্তেজনার মধ্যে তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইতেছে। তাহার ফিরিতে দেরী আছে জানিয়া কমলিই তবে দুয়ারে শিকল দিয়া বাহির হইয়া গেল! চোখের সম্মুখে গলির ও-প্রান্তে তখনও কমলিকে দেখা যাইতেছে। ওই যাইতেছে।—বনোয়ারীর চোখ বাঘের মতই জ্বলিয়া উঠিল। সে শিকারী পশুর মত নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে গলিপথটা পার হইয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। ওই চলিয়াছে। গতি দেখিয়া মনে হয় বাড়ীর পুকুরের দিকেই কমলি চলিয়াছে! হুঁ—ভুত আছে—ভুত! শুধু ভুত নয়, প্রেতিনীও চলিয়াছে তাণ্ডবে মাতিতে। বনোয়ারী এবার সন্তর্পণে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সদর রাস্তা হইতে আবার অলি-গলি ধরিয়া আসিয়া বনোয়ারী দেখিল—অনুমান তাহার সত্য; কমলি গাছের তলস্থ ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বনোয়ারী উন্মত্তের মতই ছুটিয়া চলিল। কিন্তু কি দ্রুতগতি কমলির। সে যেন বাতাসে ভর দিয়া চলিয়াছে!

উঃ!—একটা কাঁটা-গাছের গোড়ায় বনোয়ারী প্রচণ্ড ঠোক্কর খাইয়া সবেগে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল—একটা সেয়া-কুলের গুল্মের উপর। সর্ব্বাঙ্গ কাঁটায় বিঁধিয়া গেল, তবুও সে প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোনরূপে মাথা তুলিয়া দেখিল—কমলি নেই—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে মাটি পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুকজোড়া অন্ধকারের মধ্যে কমলি কোথায়

হারাইয়া গেছে! এতক্ষণে তাহার চোখে জল আসিল, কমলি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল! কমলি!

বাতাস তখন ঈষৎ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—ভূতুড়ে শিমূলগাছটার পাতলা পাতাগুলি সশব্দে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে—যেন গাছটাই খল্‌ খল্‌ করিয়া হাসিতেছে।

ওদিকে প্রায় শেষ রাত্রে বনোয়ারীর বাড়ীর ধারে দাঁড়াইয়া কয়জন ভদ্রলোক ডাকিতেছে—থানদার থানদার! বনোয়ারী!

জানালা হইতে কমলি কাতর স্বরে বলিল, মাশায়, রোঁদে বেরিয়ে এখনও ফেরে নাই—কি যে হ'ল মানুষের! মেঘ আইছে—ঝড় উঠল!

তাহার কান্না পাইতেছিল, কিন্তু লজ্জায় কান্না কোনরূপে সে রোধ করিল।

সে কথার উত্তর কেহ দিল না, তবে বলিল, এলে পাঠিয়ে দিও বাঁশ কাটতে হবে, রায়েদের বৌয়ের ছেলেটি মারা গেছে!

কমলি আবার অনুনয় করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমাদের দুয়োরের শেকলটি খুলে দিয়ে যান মাশায়। শেকল দিয়ে গিয়েছে। কাউকে ডেকে দেখি—সে কোথা রইল!

* * *

পরদিনই বনোয়ারী কমলিকে পরিত্যাগ করিল।

কমলি শুধু একটি প্রশ্ন করিল—তুমি নিজে দোরে শিকল দিয়ে যাও নাই? মনে কর দেখি!

দৃঢ়স্বরে বনোয়ারী বলিল, না।

আশ্চর্য্য! সে কথা তাহার কিছুতেই মনে পড়িল না। ভূত সে মানে না, ভ্রম সে বুঝে না। গত রাত্রির স্মৃতির মধ্যে শুধু সেই গাঢ় অন্ধকার আর সে অন্ধকারের মধ্যে কমলির আবছায়া মূর্ত্তি বাতাসে ভর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! কখন সে শিকল দিল? আবার সে দৃঢ়স্বরে বলিল, না।

কমলি উদাসনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

জুয়াড়ী

শ্রীপঞ্চমী, শীতলা ষষ্ঠী দুইদিন মেলার চলিয়া গিয়াছে। বৈধার মেলাটা প্রায় জমিয়া উঠি উঠি করিতেছিল। দোকান দুই একখানা এখনও আসিতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ দোকানই বসিয়া গেছে ছাড়া সাজিয়া উঠিয়াছে বর্ণে, বৈচিত্র্যে, গন্ধে, রসে বসন্তের মরসুমী ফুলের ক্ষেতের মত।

চায়ের ও মাংসের বড় দোকানটা চেয়ার টেবিল দিয়া সাজানও হইয়াছে। ভিতরে পর্দা দিয়া ঘিরিয়া খান দুই নিরালা কামরাও তৈয়ারী করিয়াছে ইন্দ্র ঘোষাল। পর্দা টাঙানো দরজায় আবার লিখিয়া দিয়াছে—প্রাইভেট। দোকানী ইন্দ্র ঘোষালের বন্দোবস্ত ভাল। একদিকে পান সিগারেটের দোকান, অন্যদিকে মাংস, পরোটা, চপ, কাটলেট, ডিম সাজানো। মাংসের দোকানে দু-জন কারিগর, চায়ের টেবিলে তিনটি ছোকরা খাটিতেছে। পান বেচিতেছে একটি মেয়ে।

ইন্দ্র ভিতরে একখানা তক্তাপোষের উপর আসর জাঁকিয়া বসিয়া আছে। দু' তিনখানা চেয়ারে বসিয়া দু' তিনজন ছোকরা বাবু—একজন আসিয়াছেন হুগলী হইতে, একজনের নিবাস যশোর, ফুটফুটে বাবুটি খাস কলিকাতার। মেলার কয়দিন ঘোষালের হোটেলেই থাকিবেন। ইহা ছাড়া আসিতেছে যাইতেছে এমন লোকের ত অভাব নাই। কাটোয়া, কেতুগ্রাম, দুইটা স্কুলের ছাত্র হরদম আসিতেছে। দোকানের পাশেই একটা সাইকেল রাখিবার জায়গা করা হইয়াছে। সেখানে দশ বারোখানা সাইকেলের কম আর সারা দিনে রাত্রে কখনও হয় না। সাইকেল পিছু ভাড়া লয় ঘোষাল চার পয়সা।

তক্তাপোষের উপর ঘোষালের পাশে জন তিনেক বন্ধু বসিয়াছিল। গল্প চলিতেছিল জুয়া লইয়া। এবার সব পাঞ্জাবী খেলোয়াড় আসিয়াছে।

দোকানের একটা ছোঁড়া মাঝে মাঝে হাঁকিতেছিল রকম রকম হাঁক।

—এই গরম গরম চপ, বাবুরা কপ্ কপ করে খায়।

—চা গরম, চা গরম।

—ভাগ বেটা! বাবুরা লালপানি খায়।

কথাটা বলিয়া হাসিতে হাসিতে দোকানে ঢুকিল গলাইচণ্ডীর রাখাল জুয়াড়ী। ফরসা রং, কাঁচাপাকা চুল, খরখরে করিয়া ছাঁটা বড় একজোড়া গোঁফ রাখালের। গায়ে একখানা নীল র‍্যাপার, পরণে ফুলপাড় ধুতি, পায়ে রবারের পাম্পশু।

দোকানী ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল। মজলিস শুদ্ধ লোক বলিয়া উঠিল—এই যে!

ইন্দ্র বলিল—হতভাগা মরণি তুমি। সব মাটি করে এলে ত? লগন চাঁদরে আমার!

রাখাল হাসিয়া বলিল—কেন বাপ সহস্রলোচন, তুমি ত' ছিলে এখানে, না ঘুমিয়েছিলে? হাজার চোখেই কি ঘুম পেয়েছিল বাবা?

তারপর বগলদাবা হইতে পোঁটলাটা নামাইয়া জাঁকিয়া বসিয়া রাখাল বলিল—তারপর মাটি কি রকম শুনি?

—ওই দেখ্ না, শালারা সব সারি সারি আসর পেতে বসে আছে। পাঞ্জাবী জুয়াড়ী সব। সঙ্গে তিনটে পানের দোকান, একটা ছোট সার্কাস।

এসব কথায় রাখাল কান দিল না। সে দেখিতেছিল সম্মুখেই পথের ওপারের জুয়ার আসরগুলি। ওপারের সারিবন্দী দোকানগুলার মাঝে সারি সারি চার পাঁচখানি লাল শালুর ঝালর দেওয়া সুদৃশ্য চাঁদোয়া খাটাইয়া জুয়ার আসর পাতা হইয়াছে। নীচে লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড তক্তাপোষ পাতা। মাথার উপরে চাঁদোয়ার নীচে পেট্রোম্যাক্স ডে-লাইট ঝুলিতেছে। আসরের পিছনেই দুই তিনটা তাঁবু।

খেলা তখনও পড়ে নাই। প্রথম আসরটায় বসিয়াছিল দীর্ঘাকৃতি শ্যামবর্ণ পাঠান দু'জন। মাথায় বাবরী চুল। পরণে মোগলাই ঢিলা পায়জামা, গায়ে লম্বা চুড়িদার আস্তিনের উপরে পশমের পুলওভার। একজনের মাথায় পাঠানী

কায়দায় টুপীর উপর বাঁধা পাগড়ী। আর একজন মাফলারটা পাগড়ীর মত বাঁধিয়াছে। প্রথম লোকটি তক্তাপোষের উপর গুটানো বিছানায় ঠেস দিয়া বসিয়াছিল। ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ চোখ দৃষ্টিপ্রখর, কিন্তু একান্ত অর্থশূন্য। বৈশাখের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে বিশ্রামরত চিলের দৃষ্টির মত নিস্পৃহ, উদাসীন কিন্তু তীক্ষ্ণ ভীতিপ্রদ। সম্মুখে দোকানে দোকানে, পথে কোলাহলের পরিমাণ করা যায় না, বিপুল জনতার মধ্যে নারী পুরুষের সমাবেশ-বৈচিত্র্য কল্পনাতীত অদ্ভুত; কিন্তু কোনদিকে সে দৃষ্টির স্পৃহা নাই, কৌতুহল নাই। তাহার সঙ্গীটি বিছানায় ঠেস দিয়া শুইয়া আছে। তাহার আবার মুদ্রিত দৃষ্টি। একটা বোতলে ফুরসীর কাঠামো পরানো ফুরসীতে সে মৃদু মৃদু টান দিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুজনের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ায় বুঝা যায় দু' একটা কথাবার্ত্তাও চলিতেছে।

পাশের চাঁদোয়াটার নীচের আসরে বসিয়াছিল কিশোর ছেলে একটি। বৎসর ষোল সতের বয়স। সুন্দর মুখশ্রী। আয়ত চোখ দুটি নিষ্কলঙ্ক শুভ্র। পরণে রঙীন নীল রঙের চেকদার লুঙি, গায়ে ফ্লানেলের সার্টের উপর গলাখোলা কোট। তাহারও কোন বাহ্যিক চঞ্চলতা নাই। কিন্তু দৃষ্টি হইতে মনের সাড়া কিছু যেন পাওয়া যায়। ছেলেটি ক্রমাগত এদিক হইতে ওদিকে চাহিতেছিল। প্রবহমান জনস্রোতের মধ্যে যে বস্তুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা পরমুহূর্ত্তেই ঘুর্ণীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়া কোথায় গিয়া উঠে কিশোর দৃষ্টি তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে না।

রাখাল বলিল—আরে ওটার যে গাল টিপলে দুধ বেরুবে। ওটা কেন এসেছে?

ইন্দ্র খরিদ্দারের হিসাব করিতেছিল—চা চার কাপ দু আনা, চপ চারটে চার আনা, ফেরৎ দশ আনা। পান নেন, পান। ওগো এলোকেশী, পান দাও বাবুদের, ভাল করে মসলা দিয়ে, মনমোহিনী খিলি।

ইন্দ্র এতক্ষণে হাসিয়া রাখালের কথার জবাব দিল—ঐ ছেলেটা বাবা, ও

কেউটে সাপের ডেঁকা। বাপকো বেটা সিপাহীকা ঘোড়া। বাপ সঙ্গে করে এনেছে, এখন থেকে তালিম দিচ্ছে।

সপ্রশংস হাসি হাসিয়া রাখাল বলিল—ওঃ ও যা হবে বেঁচে থাকে ত দেখতে পাবে। এইত সময়। পাতলা হাত ঘুরবে যেন কেউটের লেজ। সাঁ করে খেলে যাবে, সাধ্যি কি কারু যে ধরে।

দোকানের ছোঁড়াটার দিকে ঘুরিয়া সে আবার বলিল—চা দে ত' রে বাবা এক কাপ।

ওদিকে টেবিলের ধারেও কয়েকজন নতুন খরিদ্দার আসিয়াছিল। ইন্দ্র বলিল—এই শিশ্‌রে চা পাঁচ কাপ। টেবিলে চার, এখানে এক কাপ। ওগো এলোকেশী, একজনের সঙ্গে গল্প করো না, আরও লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কার কি চাই দাও।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া রাখাল বলিল—ও বেটা কুমীর কে রে?

সে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল শেষের আসরটার দিকে। একটা মোটা লোক উপুড় হইয়া তক্তাপোষের উপর পড়িয়া আছে। লোকটার পরণে কাপড়খানা ময়লা। গায়ে একটা সিল্কের ডবল কফ্‌ কামিজ ও তাহার উপর আঁটা কাল সাইজের একটা ওয়েষ্ট কোট।

প্রায় মধ্যাহ্নের রৌদ্র লোকটার সর্ব্বদেহের উপর পরিপূর্ণভাবে পড়িয়াছে। সামনেই বাজীওয়ালাদের সারি সারি তাঁবুর সামনে জয়ঢাক বাঁশী করতালগুলি সমবেত ধ্বনিতে বাজিয়া চলিয়াছিল উদ্দাম উন্মত্ত রোলে।

সে শব্দকেও আবৃত করিয়া মুহুর্মুহু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল জনতার হাঁক ডাক হাসি কলরব। তবুও ঘুমন্ত লোকটির নিদ্রার কোন্ ব্যাঘাত হইতেছে না। অসাড় নিস্পন্দের মত স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়া চলিয়াছে শীতের রৌদ্রসুখাবিষ্ট বিপুলদেহ হাঙরের মত।

ইন্দ্র ঘোষাল বলিল—বেটা মাড়োয়ারী। বালাখেলা টিকিটখেলা নিয়ে এসেছে লোকটা।

রাখাল কহিল—তা' হ'লে এই ক'জন ত ?

ভ্রূ দুইটা কপালের উপর তুলিয়া অতি সতর্ক কণ্ঠস্বরে ইন্দ্র বলিল—উঁ! আরও আছে। আনন্দবাজারে জন চারেক। সেখানে একটা বড় পানের দোকান খুলেছে। বল্লাম যে ছোট সার্কেসও আছে বেটাদের দলে।

—হুঁ। কি রকম ডাক টাক উঠল ?

—কাল জমিদারের কাছারীতে ডেকেছিল। এরা সময় নিয়েছে আজ দুপুর পর্য্যন্ত। আজ লোকজন দেখে বিকেল বেলা খতম ক'রে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খেলা পাতবে।

—আড়া আড়ি করে ডাকছে, না একজোট ?

ইন্দ্র বলিয়া উঠিল—হাবলা, চায়ের কাপগুলো ধুয়ে ফেল। হ্যাঁ, কি বলছিলি রাখাল! আড়া আড়ি করে ডাকছে না কি ?

—হ্যাঁ।

—কে জানে ভাই, শুনছি ত, আর কাউকে আসর পাততে দেবে না।

মুখ মচকাইয়া রাখাল বলিল—ভাগাড়ের মালরে দাদা। ভাগ না দিলে উপায় নাই। শেয়াল কুকুর শুকুনী গিধিনী যার যা ভাগ দিতেই হবে।

তারপর অকারণে জানুতে একটা চাপড় মারিয়া বলিল—এই ছোঁড়া, দে ত এক ঘটি গরম জল, পা দুটো ধুয়ে ফেলি। ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে শেষে গাঁজার নেশা ছেড়ে যাবে।

ইন্দ্র বলিল—তুই এত দেরী করলি যে ? দু দিন মেলা হয়ে গেল—

রাখাল আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল—সে বিপদের কথা আর বলিস কেন ভাই ? মাগী আমার হঠাৎ ধর্ম্মপুত্তুর নারদ হয়ে উঠেছে। দিনরাত ধর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া। কিছুতেই আসতে দেবে না।

—কেন ? হঠাৎ—

—মাগী বলে কি—কুষ্ঠ হল তবু তোমার জ্ঞান হল না ? শোন কথা ? আমি বলি—ওরে মাগী, যুধিষ্ঠিরের বেটী হিড়ম্বে, কুষ্ঠ তুই কোন খানে

পেলি? কান নাক মুখ কোথাও এতটুকু বৈলক্ষণ আছে? ডান হাতের দুটো আঙুল এক পাব করে ছোট হয়ে গেল, সে শুধু জুয়ার গুটির ঘেঁস লেগে লেগে। তা না, মাগী বলে কুষ্ঠ। বল দেখি ভাই, তুই বলত ইন্দ্র।

কথা কহিতে কহিতে কখন সে ডান হাতখানি বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সত্যই দুইটি আঙুলের মাথা ছাড়া অপর সমস্ত আঙুলগুলি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন বিকৃতি নাই। কথা শেষ করিয়া বারকয় আঙুলগুলি ভাঁজিয়া খুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—এই নাকি কুষ্ঠ হয়?

আবার সজাগ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—তারপর বলে একমাত্র মেয়ে সেও মরেছে তোর ওই পাপে। নাও, শুনবে কথা, শোন। আমি বলি—ওরে মাগী, পাশা খেললে শকুনি, রাজ্য পেলে দুর্য্যোধন, পরিবার হারালেন ধম্মপুত্তুর কিন্তু বাবা ভীমের বেটা ঘটোৎকচ কোন পাপে মরে শুনি? কুরুক্ষেত্তে ম'ল আঠারো অক্ষৌহিণী, সবারই বাবা কি জুয়ো খেলত না কি? বলি মরার কিছু মানে হয় না কি?

ইন্দ্র হোটেলওয়ালা চমকাইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—কি বল্লি রাখাল, কে মরেছে? শৈল? শৈল আজ নাই?

ছোট্ট শৈলকে সঙ্গে করিয়া রাখাল কতবার এ খেলায় আসিয়াছে। ইন্দ্রের কাছেই সে থাকিত। সেই দুরন্ত ফুটফুটে মেয়েটি!

রাখাল ধমকাইয়া উঠিল চাকরটাকে—এই ছোঁড়া জল দে না রে! ইন্দ্র বলিতেছিল—শৈল মা না-ই!

সংক্ষেপে রাখাল বলিল—না। উঃ, পুড়িয়ে মারবি না কি রে ছোঁড়া। তোর আক্কেল দাঁত উঠে নাই না কিরে এখনও? দে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে দে।

ইন্দ্র তখনও ভাবিতেছিল শৈলর কথা। সে রাখালের গায়ে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—তুই বলছিস কি রাখাল? কি হয়েছিল? মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া রাখাল মুখ নত করিয়া পা ধুইতে ধুইতে বলিল—জ্বর।

জ্বর? এমন কি জ্বর হ'ল রে রাখাল, যে—

রাখাল বলিল—থাক, ওসব কথায় কি ফল বল দেখি ইন্দ্র? তারপর দু'জনেই নীরব। ইন্দ্র বিস্মিত উদাসীন দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল ওই কথা। পথের ভীড়ের মধ্যে দুরন্ত মেয়ের ছবিখানি যেন লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। রাখাল হেঁট হইয়া গরম জল দিয়া সযত্নে পায়ের ময়লা তুলিতেছিল।

দোকানের কারিকর হাঁকে—মেটে কোর্ম্মা এক পোয়া তিন আনা। এই নেন পয়সা।

চায়ের ছোঁড়াটা কারিকরকে বলে—এখানে ডিম সিদ্ধ দাও দুটো। মরিচগুঁড়ো নুণ দিয়ে দিও। আপনার কি চাই মশাই? চা? বসুন, বসুন।

পথে জন কোলাহল ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। অন্নক্ষেত্রগুলায় হরিনামের বিরাম নাই। ধোঁয়ায় ধূলায় কলরবে উপরের আকাশ যেন আচ্ছন্ন মূর্চ্ছিত। চারিদিকে একটা বিপুল উদ্দামতা উদ্বেল আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। দলে দলে মানুষ আর মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধহীন কিন্তু একান্ত নিবিড় প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। এখানকার হাসি শেষ হয় গিয়া ওখানে। পিছনে পিছনে তখন আরও পিছনের হাসি মুখরিত হইতে হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়া গেছে।

ইন্দ্র তখনও অভিভূতের মত বসিয়াছিল। হাত পা ধোয়া শেষ করিয়া রাখাল তাহাকে ডাকিয়া বলিল—টাকা চাই যে ইন্দ্র। সে পকেট হইতে বাহির করিল ছোট্ট একটি পুঁটুলী। গিঁঠ খুলিয়া বাহির করিল কয়দফা সোনার গহনা।

ইন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিল। রাখাল বলিল—মাগী কিছুতেই টাকা দিলে না। বলে—সর্ব্বস্ব নাশালে আর থাকবে কোথা হতে? দেখ দেখি ভাই? যখন মদে ভাঙে উড়িয়েছি তখন উড়িয়েছি। আর ছিলই বা এমন কি বাবা? বাবা ত' রেখে গিয়েছিল গাঁজার কল্কে, মদের বোতল আর বিঘে পনর জমি। তা' একহাতে নিলাম কল্কে একহাতে নিলাম বোতল, মাঝখান

থেকে জমি ক' বিঘেই ফক্কে বেরিয়ে গেল। তার আর আমি করব কি? বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠে। ইন্দ্রও এতক্ষণে তাহার বিমূঢ়তা অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—গয়না দিলে তোকে সে?

রাখাল বলিয়া উঠিল—হুঁ্যা দিলে! দেবার ছেলে কি না মাগী!

—তবে কি বাক্স ভাঙলি?

—সেও যে কোথা পুঁতে রেখেছে তার পাত্তা নাই।

—তবে এসব কার?

—মাগীরই আবার কার! ঘুমও বাবা মাগীর আপনার হয় না, নিস্থু সেঁকরার কাতারীও তার সহোদর ভাই নয় যে খাতির করবে তার। নিলাম ক্যাঁচ করে কেটে। দেখ দেখ তুই এখন টাকা দেখ। আমি বেটাদের সঙ্গে আলাপ করি একবার। শো দুই বুঝলি! মাল থাকে ত দে না একটা পাঁট।

ধমক দিয়া ইন্দ্র বলিল—এখন নয়, সে সন্ধ্যে বেলা। যা না ওদের মজলিশে, গাঁজা চরস খুব চলেছে।

* * *

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিতেই রাখাল তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিল। পাঠানদের সঙ্গে সে তখন রীতিমত জমাইয়া বসিয়াছে। পাঠান দু'জনের একজন জুয়ার ছকের তাড়া খুলিয়া রাখালকে দেখাইতেছিল। অন্যজন তৈয়ারী করিতেছিল গাঁজা। ইন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইতেই পাঠান ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিল। রাখাল মৃদুস্বরে বলিল—বেরাদার লোক।

পাঠান অতি মৃদু হাসিয়া বলিল—বৈঠিয়ে।

ইন্দ্রও অল্প হাসিয়া বসিল। পাঠান জিজ্ঞাসা করিল—উ আপকা দুকান?

—হাঁ জনাব। সব চিজ মিলবে আমার পাশ।

—বহুৎ আচ্ছা।

রাখাল বলিল—আমি ওকে কমিশন দিই। বহুৎ হাতী ও ফাঁদে এনে ফেলে। বড় বড় আদমীর ওরই দোকানে আড্ডা।

প্রবল আগ্রহপূর্ণ বিস্ময়ে পাঠান বলিয়া উঠিল—হু ?

অহঙ্কার করিয়া রাখাল বলিল—হুঁ। তা ছাড়া পঞ্চাশ গুণ্ডা ওর হাতে।

পাঠান মৃদু হাসিল। তারপর একান্ত অন্যমনস্কভাবে হাতে মুঠি বাঁধিয়া ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত ভাঁজিয়া লইয়া বিছানার তল হইতে বাহির করিল খাপে মোড়া প্রকাণ্ড একখানা ছোরা।

রাখাল হাসিয়া ইন্দ্রকে বলিল—তোর দোকানের কুকরীগুলো এর চেয়ে বড় নয় ?

ইন্দ্র ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর বলিল—হ্যাঁ।

দ্বিতীয় পাঠান গাঁজার কলিকা তৈয়ার করিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল—পি জিয়ে।

রাখাল জিভ কাটিয়া বলিল—আরে বাপরে, আপলোক আগে। সোনা বাইরে আঁচলে গিঁঠ! দেবতা ফেলে হনুর খাতির।· ও রামায়ণী কাণ্ড এ কালে চলে না।

পাঠান আর আপত্তি করিল না। সে টান মারিয়া রাখালকে কলিকা আগাইয়া দিল। রাখাল দিল ইন্দ্রকে, ইন্দ্র দিল প্রথম পাঠানকে। সে বার দুই টান দিয়া কলিকাটা উপুড় করিয়া দিয়া বলিল—ফিন বানাও। পাশের আসরের ছেলেটিকে বলিল—শেঠজীকে বোলাইয়ে ত। ভুরাকে সাথ উ আচ্ছা বনাওয়ে হ্যায়। ছিলম ভি বড়া উস্কা।

ছেলেটি উঠিয়া গিয়া ঘুমন্ত মাড়োয়ারীকে বার দুই ঠেলা দিয়া ডাকিল। বিপুল ভাবে কয়টা আড়মোড়া দিয়া শেঠজী উঠিয়া বসিল। তারপর উঠিয়া আসিল এ আসরে।

পাঠান হাসিয়া বলিল—নিদ ঠিক হুয়া ?

অসন্তুষ্ট মুখে শেঠজী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কাম নেহি কিয়া করে ভাই। দেহকে সচ্ছ ঠাণ্ডা বন যাতা বৈঠকে বৈঠকে। দ্বিতীয় পাঠান খানিকটা গাঁজা তাহার হাতে দিয়া বলিল—বনাইয়ে।

গাঁজা তৈয়ারী আরম্ভ হইল। প্রথম পাঠান বলিল—ছক একঠো লে লিজিয়ে। যেই ঠো আপকো পছন্ হোয়।

রাখাল ইন্দ্রকে দেখাইয়া বলিল—দেখরে, পছন্দ করে দে একটা। তুমি বেটা দেবরাজী আমার, উর্ব্বশী দেখা চোখ, চোখ ভাল তোর!

ইন্দ্র একটা পছন্দ করিয়া দিল। ছকটার চারিকোণে চারিটা বড় বড় ফুটন্ত গোলাপ। ঘরগুলোকে বেড়িয়া বেড়িয়া গোলাপের লতা ফুল। রাখাল দেখিয়া বলিল—বলিহারী বাপ সহস্রলোচন, হাজার হোক পারিজাত দেখা চোখরে বাপু। তা হ'লে এই হ'ল শেঠজী। এক ছক আমার রইল। যা ডাক হবে অংশ মাফিক টাকা কাল সকালে। পাঠান বলিল—বহুৎ আচ্ছা।

গাঁজার কলিকা সাজা হইয়াছিল। তাহাতে টান চলিতে লাগিল।

কলিকাটা শেষ করিয়া রাখাল বলিল—তা হ'লে তাই কথা রইল।

পাঠান বলিল—আপ কসম্ খা লিজিয়ে, বাস বাত পাক্কা।

রাখাল পকেট হইতে জুয়ার ঘুঁটি বাহির করিয়া বলিল—ইসকে কসম্।

—বাস্ বাস্।

শেঠ বলিল—বইঠিয়ে বইঠিয়ে। ফিন বনাতা হ্যায় হাম। চরস পিতা হ্যায়? দো নো সেট করকে পুরা ছিলম বনাই?

রাখাল বলিল—জরুর।

পাঠান হাতের দস্তানাটা খুলিতেছিল। রাখাল বলিয়া উঠিল—আপকা হাতের ভি চামড়া উঠ্ গিয়া ঘুঁটিকে ঘেঁস লেগে? আমার আঙুলের ছুটো পাবই খসে গেল।

পাঠানের হাতে বিশ্রী সাদা সাদা দাগ। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দ্বিতীয় পাঠান একটা টিনের বাক্স হইতে মোটা রুটি বাহির করিয়া গোগ্রাসে গিলিতেছিল।

আহার করিয়া রাখাল ঘোষালের দোকানেই ঘুমাইতেছিল। উঠিল অপরাহ্ণে! থমথমে গম্ভীর মুখে পথের দিকে চাহিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। লোক লোক আর লোক। ব্যষ্টির গতি নাই, গতি আছে সমষ্টির। কুটার মত প্রবাহের টানে চলিয়াছে। দোকানে দোকানে বেচা-কেনার বাদ-প্রতিবাদ, পথে হাসি কলরব ফেনাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছিল।

পথযাত্রীর ভিড়ের মধ্যে কে কাহাকে ডাকিতেছিল—মহাদেব, মহাদেব রে! কে একজন উত্তর দেয়—ওই দেখ জুয়োর আড্ডায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

কি রসিকতা উহার মধ্যে ছিল কে জানে কিন্তু তবুও একটা বিপুল হাসি সঙ্গে সঙ্গে কাচের বাসনের মত সশব্দে ভাঙিয়া পড়ে জনপ্রবাহের মধ্যে। রাখাল উঠিয়া পড়িল। ভিড় ঠেলিয়া জুয়ার আড্ডায় গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রকে বলিল—আলো ঠিক কর। খতম হয়ে গেছে জমিদারের সঙ্গে। তেরশো, আমলা খরচ তিনশো। দেরী করিসনে।

চেয়ারে বসিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সে পথের জনপ্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিল। রাখালও অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। ওপাশে জুয়ার আসরে পাঠানও গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। মাথার উপর খাটানো ডে-লাইটটার কি যেন একটা গণ্ডগোল হইয়াছে। সেটা একজন মেরামত করিতেছিল। পাঠান তির্য্যক দৃষ্টিতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সেই দিকে চাহিয়া আছে।

একটা পর্দ্দা-ঢাকা তাঁবুর দুয়ারে চেয়ার লইয়া বসিয়া আছে শেঠজী। বড় বড় চোখ দুটি জবা ফুলের মত রাঙা। মুখের চামড়ার অন্তরালেই সমস্ত রক্তপ্রবাহের চাপ যেন আলোড়িত হইতেছে। ক্রমাগত সে আপনার গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিতেছে।

রাখাল বলিল—ইন্দ্র, একটা পাঁট দে।

ইন্দ্র বলিল—এখন না।

রাখাল বলিয়া উঠিল—ওরে বেটা আদা বেচছিস আদাই বেচ, জাহাজের ওপর দাঁড়াসনি কখনও। বুঝবি কি? নেশা চাই প্রথম তোড়ে। লোক

দেখছিস না? বুকের মধ্যে কি হচ্ছে তা জানিস? দেখ হাত দিয়ে। শালা পাঁজরাটা খুলে দিলে সার্কেসের জয়ঢাকের চেয়েও জোরে বাজত!

একজন পাঠান আসিয়া ইন্দ্রকে বলিল—দোঠো বোতল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। রাখাল বলিল—চালিয়ে, নিয়ে যাচ্ছি আমি।

পাঠান মৃদুস্বরে বলিল—লিখকে রাখিয়ে।

তিনটি বোতল বগলে পুরিয়া রাখাল বলিল—দেখ, পুঁটুলির ভেতরে ছোট ছোরা খানা আছে। বাগিয়ে দে ত কোমরে বেঁধে।

আসরে বসিয়া পাঠান একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল পশ্চিমের মাঠের দিকে। একফালি রাস্তার মধ্য দিয়া মাঠখানা বেশ দেখা যায়! অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা আলোয় মাঠখানা ঝল মল করিতেছিল। দিগন্ত পর্য্যন্ত গ্রামের চিহ্ন নাই। শব্দে পাঠান রাখালের আগমন অনুভব করিয়াছিল। পাঠান বলিল—রাখাল ভাই, দেখিয়ে।

সে চোখ ফিরাইল না। শুধু তর্জ্জনী নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল মাঠের পথ। রাখাল দেখিল দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত আঁকা বাঁকা পথটি আগন্তুক জন প্রবাহে যেন জমাট বাঁধিয়া এক হইয়া গিয়াছে। গতির চঞ্চলতা বুঝা যায় শুধু পরিধেয়ের বিভিন্ন বর্ণের স্থান পরিবর্ত্তনে। যেন এক বিপুল বিচিত্রবর্ণ অজগর দিগন্তের গহ্বর ত্যাগ করিয়া নূতন গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারই মসৃণ বিচিত্রবর্ণ গাত্রচর্ম্মে আলোক সম্পাতে প্রতিবিম্ব মুহুর্মুহু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

পাঠান নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বলিল—চলিয়ে তাঁবুকে অন্দর। ছোট ছেলেটিকে বলিল—শেঠজীকো ভেজ দেও।

একটা বোতল খুলিয়া গ্লাসে গ্লাসে পরিবেশন করিয়া দিয়া, নীরবে একটা গ্লাস তুলিয়া লইয়া নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল।

নিঃশব্দে গ্লাসের পর গ্লাস শূন্য হইয়া যাইতেছিল। একটা বোতল শেষ হইল, দোসরা বোতল খোলা হইল। শেঠজী তৈয়ার করিতেছিল গাঁজা।

পাঠান অকস্মাৎ গা ঝাড়া দিয়া খাড়া হইয়া বসিল। কালো মুখখানা তখন থমথম করিতেছে। সে ডাক দিল—রহমন্, ফরাস বিছা দেও। বাত্তি সব ঠিক হ্যায় ?

ছোকরা উত্তর দিল—হাঁ, ঠিক হ্যায় !

পাঠান ছোট একটা সুটকেশ টানিয়া বাছিতে লাগিল জুয়ার ঘুঁটি। দ্বিতীয় পাঠানকে বলিল—দখিন পাহাড়কে আসরমে দোঠো বোতল লেকে পৌঁছে দেও ভাই। সার্কাসমে দেখো কেতনা বোতল হ্যায়।

গাঁজায় আগুন চড়িল। রাখালের মাথা উগ্র উত্তেজনায় রন্ রন্ করিতেছিল। তাঁবুর দুয়ারের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো আর বোঝা যায় না, চারিদিকে ঝল মল করিতেছে শুভ্র উজ্জ্বল আলোকমালা। ও দিকে বাজিতেছে সার্কাসের বাজনা। উন্মত্ত উদ্দাম সঙ্গীতে রক্তধারা নাচিয়া নাচিয়া ওঠে। রাখাল কখন আপন মনে তাল দিয়া পা ঠুকিতে সুরু করিয়াছে। পাঠান সমস্ত দেহখানা লইয়াই ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

—হা-হা-হা, হো-হো-হো।

বিপুল আবর্ত্তে একটা হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রাখাল সজোরে পর্দ্দা-খানা টানিয়া খুলিয়া জনতার দিকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে চাহিয়া রহিল। যেন জনতার প্রত্যেক মানুষটি তাহার প্রতিপক্ষ। পিছনে পাঠান অকস্মাৎ চিলের মত তীক্ষ্ণ কঠিন কণ্ঠস্বরে হাঁকিয়া উঠিল—আও আও, চলে আও, চকা চক, চকা চক।

হাড়ের ঘুঁটি চামড়ার খোলের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করিয়া উঠিল—খল খল খল। যেন হাসিয়া উঠিল।

আসরে আসরে খেলা বসিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আলোক স্পর্শে রঙীন ছকগুলি আতসী কাঁচের মত ঝকমক করিতেছে। মাথার উপরে ঝলমল করিতেছে চাঁদোয়ার মধ্যে লাল সালুর লতাপাতা আর ঝালর। প্রত্যেক আসরের পাশেই দুই চারিজন করিয়া জমিতে সুরু করিয়াছে। পাঠানের আসরে খেলিতেছিল সেই ছেলেটি। পিছনে পাঠান ঘুরিতেছে। রাখালের

আসরে খেলিতেছে ইন্দ্র। রাখাল পাশে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে দান ধরিতেছিল।

ছেলেটি হাঁকিল—জাহাজ, চিড়িতন, কাঁটা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুঁটি ঘরে ঘরে বসাইয়া দিয়া বাকী ঘর হইতে টানিয়া কোলের কাছে জড় করিল কয়টা আনি, কতকগুলা পয়সা।

ইন্দ্র দান ফেলিয়া হাঁকিল—চলো, চলো ভাই। নসীবকে খেলা, ধর্ম্মের দান। ধরো ধরো, একটাকায় ছু'টাকা, পাঁচ ধরো দশ পাবে। বিশ পঁচিশ যার যত খুসী।

রাখাল ধরিল জাহাজে একটাকা। হরতনে একটি সিকি। সঙ্গে সঙ্গে ছকের উপর পড়িতে লাগিল পয়সা আনি দুআনি। জাহাজের ঘরটা বোঝাই হইয়া গেল। ঠক করিয়া পড়িল একটা টাকা হরতনের ঘরে। রাখাল বলিল—কার টাকা? ভিড়ের মধ্য হইতে উঁকি মারিয়া একজন বলিল—আমার।

—কত?

—টাকা সই।

রাখাল মৃদু হাসিল। সে জানে হরতন বাজী মারিয়াছে। দান উঠিল দুই হরতন, এক কাঁটা। ইন্দ্র জাহাজ খালি করিয়া কোলের কাছে সব টানিয়া লইল। হরতনের ঘরে ফেলিয়া দিল দুইটা টাকা ও একটা আধুলি। আধুলিটা রাখালের সিকির দরুণ।

পাঠানের ওখানে কাঁদিয়া উঠিল একটি ছেলে। পাঠান একটা হাত ধরিয়া সজোরে পেষণ করিতেছিল। ছেলেটির হাত হইতে ছকের উপর পড়িয়া গেল একটি পয়সা। পাঠান মৃদু হাসিয়া ছেলেটির হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—জুয়াকে ছক সে চোরী?

ছেলেটি দান ধরিয়াছিল। কিন্তু হারিয়াছে দেখিয়া চুপি চুপি পয়সা উঠাইয়া লইয়াছে।

ও দিকে শেঠজীর তাঁবুর সম্মুখেও ভিড় জমিয়াছে। তাঁবুর মধ্যে লাল শালুতে মোড়া প্রকাণ্ড টেবিলে দশ টাকা হইতে সিকি পর্য্যন্ত থরে থরে সাজান। তাঁবুর বাহিরে বাঁধা বাঁশের এধার হইতে পিতলের বালা ছুড়িয়া ছুড়িয়া দান গুলিতে পড়াইবার চেষ্টা চলিতেছিল। চার চার পয়সা এক এক বালা। একটি ছেলে বেচিতেছিল বালা। শেঠ লক্ষ্যভ্রষ্ট বালাগুলি কুড়াইয়া আঙ্গুলে পরাইয়া তুলিতেছিল।

শেঠ হাঁকিতেছিল—কাট গিয়া ফাকা। কিসকে বালা, আধুলি মার দিয়া এক। চলো, চলো ভাই। চার পয়সা, চার চার পয়সা। দশ রুপেয়া দান হ্যায়। চলো—চলো।

কোন আসরেই লোক গাঁথা পড়ে না। ভাসা লোক আসে, দু' চার আনা হারে কি জেতে চলিয়া যায়।

রাখালের আসরে দান চলিতেছিল।

—আমার চার আনা দু'ঘরে, জাহাজ, রুইতন।

—দু' আনা জাহাজ সই!

রাখাল ধরিল—ইস্কাপন দু'টাকা। কাঁটা দু'আনা।

কাঁটায় ঝপ করিয়া আসিয়া পড়িল—চার টাকা সই। সেই লোকটি। রাখাল লক্ষ্য করিয়া মৃদু-হাসিল। দান উঠিল,—দুই ইস্কাপন এক জাহাজ। লোকটি এবার মরিয়াছে! রাখাল ইচ্ছা করিয়াই এসব করিয়াছিল।

ইন্দ্র হাঁকিল—কার জাহাজ দু' আনা—এই দু' আনা।

—রুইতন জাহাজ বিট গেল। সিকি তুলে নাও।

লোকটি গোল বাধাইয়া তুলিল—আমার জাহাজের দান কৈ?

রাখাল বলিয়া উঠিল—কে হে আমার বাউল চাঁদ? হিসেব বোঝ না? রুইতনে দু' আনা যায়নি তোমার? দেখি ভাই, মুখখানি তোমার?

কে বলিয়া উঠিল—বেটা তাঁতীরে!

লোকটি মৃদু হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে আমি জেলে।

হাসির কলরোল পড়িয়া গেল।

দান পড়িল। ঝুন ঝান, ঠুন ঠান শব্দে সিকি আধুলি দোয়ানি পয়সা ঘরে ঘরে পড়িয়া গেল।

রাখাল হাঁকিল—ধরো দান। জুয়োয় হেরে তবে ধম্মপুত্তু রাজা, জুয়োয় হেরে নল কল্লে কলিনাশ। ধরো বাবা ধরো।

ঝম করিয়া কাঁটার ঘরে ফের পড়িল চার টাকা। সেই মুখ উঁকি মারিয়া বলিল—সই।

রাখাল উঠিয়া পড়িল, বলিল—আসছি আমি।

আসরে খেলোয়াড় ভিড়িয়াছে। রাখালের সর্ব্বদেহের রক্ত সুরার মত ফেনিল হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রের দোকানে গিয়া একটা মদের বোতল খুলিয়া গ্লাসে ঢালিবার আর অবসর হইল না। বোতলের মুখে মুখ লাগাইয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। তারপর সেটা হাতে করিয়া আসরে তক্তাপোষের নীচে সেটাকে রাখিয়া বিড়ি ধরাইল। ইন্দ্র তখন দান তুলিয়া দান মিটাইতেছিল।

কাঁটা বাজী জিতিয়াছে।

রাখাল হাঁকিল—এই ছোকরা, সিগারেট, কাঁইচি। দু' বাক্স।

তারপর তক্তাপোষের পাশে বসিয়া গাঁজা টিপিতে আরম্ভ করিল। দান চলিতেছিল। লোকটা দু'এক বাজী বাদ দিয়া খেলিয়া যায়। সে ঝপাঝপ বাজী জিতিতেছিল।

রাখাল সিগারেটের বাক্স আগাইয়া দিয়া বলিল—খান, সিগারেট খান।

লোকটি এখন সামনে দাঁড়াইয়াই খেলিতেছিল। মধ্যবিত্ত চাষী লোক। বয়সও হইয়াছে চল্লিশের উপর। সিগারেট ধরাইয়া লোকটি চাপিয়া বসিল।

গাঁজার কলিকাটা ইন্দ্রের হাতে দিয়া রাখাল বলিল—আগুন দে।

ইন্দ্রকে ঠেলিয়া দিয়া বসিয়া পড়িল নিজে। চামড়ার খোলের মধ্যে ঘুঁটি কয়টা ফেলিয়া নাড়া দিয়া বলিল—এই চলে যায় নসীবের নেকা। ধরে নাও,

যে পার সে ধরে নাও শ্রীবৎস রাজার সোনার বাট, নৌকো বোঝাই চলে যায়। ধরো দান, ধরো দান। এই দুই কাঁটা, এক জাহাজ!

সে লোকটি এবার দান ধরে নাই। গাঁজায় টান দিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া রাখাল আবার দান ধরিল।

লোকটি একটাকা দান ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে পড়িতে লাগিল আধুলি সিকি।

রাখাল দান তুলিল—রাখাল হারিয়াছে।

ওদিকের আসরে পাঠানের তীক্ষ্ণ স্বর জনতার কোলাহল ভেদ করিয়া ছুটিয়া গেল তীরের মত।—চলো, চকাচক, চকাচক, চলো, চলো। রাখাল চাহিয়া দেখিল পাঠান খেলায় বসিয়াছে। থম থম করিতেছে কালো মুখ। ডে লাইটের আলোর প্রতিবিম্বেই বোধকরি ঝকমক করিতেছে ছোট ছোট চোখ দুটি সূর্য্য-প্রতিবিম্বিত শিশির-কণার মত। জুয়ার ঘুঁটি লইয়া হাত খেলিতেছে যেন সাপের ফনা। তাহার আসরে চাপিয়া বসিয়াছে মোটাসোটা আধভদ্র একটি লোক।

রাখাল দান ধরিল।—তুমি জিতলে আমি হারি, আমি জিতলে তোমার হার। দুনিয়া জুয়ার খেলা দাদা। কসে নাও কপাল তোমার, কসে নাও এইখানে।

পাঠান হাঁকিল—খেলোয়ারী কা খেল, ভাণ্ডার লুটা যায়। চলো, চকাচক।

এবারও রাখাল হারিয়াছে। তক্তাপোষের তলা হইতে বোতলটা লইয়া আবার সে পান করিল। রাখাল হারিয়া হারিয়া হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। গভীর চিন্তায় খেলা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে সে লোকটির কৌশল বুঝিয়া লইল! ছকের একদিক হইতে পর পর ঘরে সে দান ধরিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে দেয় এক এক বাজী বিরতি।

সে অধীর হইয়া হাঁকিল—ইন্দ্র আর এক বোতল।

ইন্দ্র বলিল—নাই আর!

এক মুঠা সিকি আধুলি তুলিয়া হাতে দিয়া রাখাল বলিল—যেখানে পাস, নিয়ে আয়।

অতঃপর নিঃশব্দে খেলা চলে। চারিদিকে কোলাহল গম গম করিতেছিল। বাজীর বাজনা, মানুষের কলরব, গানের আসরের গান এই ছোট স্থানটুকুর আশে পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। এখানকার কাহার কানে কিছু আসে না। গভীর নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে মানুষ কয়টি যেন ডুবিয়া আছে। আসরের বুকে ছকের ঘর কয়টি, ঘুঁটি তিনটির উপরের অংশ ছাড়া সমস্ত সংসার, বস্তু যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চামড়ার খোলের মধ্যে ঘুঁটি খল খল করিয়া হাসে। ছকের ঘরে ঘরে ঝপাঝপ নিঃশব্দ দান ধরিয়া যায়। দান ওঠে। মনে মনে হিসাব চলে। জুয়াড়ী ঘরে দান মিটাইয়া দিয়া বাকী নিজের কোলে টানিয়া লয়। আবার ঘুঁটি খল খল করিয়া হাসে। সিগারেটের পর সিগারেট, মদের বোতল, গাঁজার কলিকা পর পর নিঃশেষ হইয়া চলিয়াছিল। এবার লোকটি হারিয়া চলিয়াছে। তাহার পিছন হইতে বার বার একজন বলিতেছিল—উঠে এস।

প্রদীপ্ত চিন্তাকুল দৃষ্টিতে ছকের ঘরে ঘরে চোখ বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল—যাই।

কিন্তু সে আবার ধরে দান। সেবার বাজী জেতে। আবার খেলা চলে।

রাত-ভিখারী ফকিরের দল ভিক্ষা চায়—জয় হোক বাবা। রাখাল দান তুলিয়া ঘুঁটিগুলি ঘরে ঘরে বসাইয়া যায়। দান মিটায়।

বাবা!

রাখাল তক্তার তলা হইতে বোতল তুলিয়া ঢক ঢক করিয়া পান করে সুরা। রক্তজবার মত চোখ মেলিয়া ফকিরদের দিকে শুধু চায় একবার। তারপর আবার চলে দান।

ফকিরের দল চলিয়া যায়। রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে। এত বড়

মেলা, বিপুল জনতা ভোজবাজির মত রূপান্তরিত হইতেছিল। দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়িয়া দেখা যায় শুধু চটের সারি। জনহীন পথ মৃদু বাতাসে ধূলি-চঞ্চল। আবর্জ্জনার স্তূপের উপর বিশ্রামরত কুকুরের দল মাঝে মাঝে উচ্ছিষ্ট লেহন করে আর ঝিমায়। কোন সার্কাসের তাঁবুর ভিতরে নিস্তব্ধ গভীর রাত্রির আভাস পাইয়া বন্দী বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে।

রাখালের আসরের লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সঙ্গীকে বলিল—চল।

সঙ্গী বলিল—তারপর?

—তারপর আর কি? হেঁটেই বাড়ী যাব। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সঙ্গীকে বলিল—মেয়েটা কাঁদবে হে, কটা জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিল।

রাখালের মাথাও ঝিম ঝিম করিতেছিল। সে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল কোলের নিকট স্তূপীকৃত রজত-ঔজ্জ্বল্যের দিকে।

কথাটা তাহার কানে গিয়াছিল। সিকি আধুলি পয়সায় এক মুঠা সে লোকটির হাতে তুলিয়া দিয়া চাহিয়া রহিল অন্ধকার রাত্রির দিকে।

পাঠানের আসরেও খেলা শেষ হইয়াছিল। তাহার খেলোয়াড় বলিল—সব ত' হারলাম। জল খাব, কিছু দাও। পাঠান নীরবে ঠন্ করিয়া একটি টাকা ফেলিয়া দিল। আস্ফালন করিয়া রাখাল অকস্মাৎ জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল—পাই একবার যমের সঙ্গে জুয়ো খেলতে!

পাঠান তখন টাকাকড়ি বুকের তলে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। রাখালও তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল।